সম্পাদকীয় ঃ

আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) কে মহান আল্লাহতাআলার দেয়া প্রতিশ্রুতি *'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব'* পূর্ণতার আরো এক দৃশ্য বিশ্ববাসী অবলোকন করার সৌভাগ্য লাভ করলো ৫ জুলাই ২০০৮। কানাডার ক্যালগেরিতে শুভ উদ্বোধন করা হলো নব নির্মিত বিশালকায় সুদৃশ্য মসজিদ **বায়তুন নূর**।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস তাঁর গৌরবদীপ্ত খিলাফত কালে আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশ্বের জাতিবর্গকে খিলাফতের কল্যাণধারা বিতরণ করতে অবিরাম নিজ পবিত্র সাহচর্য্য দান করে যাচ্ছেন। কল্যাণমন্ডিত সেই কর্মসূচীর আওতায় হুযুর (আই.) আফ্রিকার জাতিবর্গকে সান্নিধ্যদানের পর আমেরিকার জাতিবর্গকে উক্ত পবিত্র সংস্পর্শ দানে ধন্য করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় কানাডা সফরকালে তিনি (আই.) বায়তুন নূর মসজিদের শুভ উদ্বোধন করেন।

ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য্যের চিরন্তন রূপ যা হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) প্রামাণিক এক নিদর্শন আকারে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিতে আদিষ্ট হয়েছেন তারই কার্যকর প্রতিফলন ঘটছে দেশে দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের বিপুল সংখ্যক মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে। এসব মসজিদ থেকে তৌহিদের অমোঘ বাণীর সাথে প্রেমময় আহবান - **LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE** *(ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে)* - কুফরীর আধার কাটিয়ে বিধর্মীদের হৃদয়ে তৌহিদের নূরের স্ফুরণ ঘটিয়ে চলছে। এরই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার এর আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের মসজিদ বায়তুন নূর এর উদ্বোধনকালে স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে ইসলামের স্বপক্ষে স্বীকারোক্তি মূলক নিম্নোক্ত বক্তব্যে।

"The Mosque reflects," the Prime Minister Stephen Harper said "the true and benevolent face of Islam." He praised Hadhrat Mirza Masroor Ahmad as a "courageous champion of religious freedom and of peace," and applauded him for denouncing anyone who perverts faith by using it as a justification for violence. "However we define God, it is wrong to kill in his name," Mr. Harper said.

(The Al Islam eGazette, August-2008)

১৫ আগষ্ট ২০০৮

সূচী পত্র	*পৃষ্ঠা নং*
● **কুরআন শরীফ**	৪
● **হাদীস শরীফ**	৫
● **অমৃত বাণী**	৬
● ***জুমুআর খুতবা ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)***	৭-১৭
● ***জুমুআর খুতবা ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)***	১৮-২৩
● **কুরআন আমার প্রিয় কুরআন** আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৪-২৭
● **ইসলামে খিলাফত** ফরিদ আহমদ **(যুক্তরাজ্য)**	**২৮-৩১**
● **বিবি খাদিজার সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর শুভ পরিণয়** সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধূরী	৩২-৩৪
● **সীরু ফিল আরদ-ভ্রমণ কর পৃথিবীময়** **ভারতের কয়েকটি ভ্রমণ স্পট** **মাহমুদ আহমদ সুমন**	৩৫-৩৯
● **সংবাদ**	**৪০-৪২**

প্রচ্ছদ : আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের পতাকা –
এবং তাজাকিস্তান, পেলাও, আইসল্যান্ড ও লাটভিয়া-র পতাকা
ডিজাইন : তারেক আহমদ (সবুজ)

অর্থাৎ -"মসজিদ ইসলামের কল্যাণদানকারী রূপের প্রতিফলন ঘটায়"। আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের প্রশংসা করে তিনি মন্তব্য করেন "শান্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় এক সাহসী বীর হলেন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ। যে কেউ নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রসার ঘটাতে গিয়ে একে সন্ত্রাসি কর্মকান্ডের হাতিয়ার বানাতে চায় তা তিনি (হুযুর) সম্পূর্ণ রূপে অবমাননাকর বলে সাব্যস্ত করেছেন। যে ভাবেই আল্লাহতাআলাকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা চালানো হোক, তাঁর নামে নরহত্যা মারাত্মক ভুল বৈ অন্য কিছু নয়"। (দি আল ইসলাম ই-গেজেট, আগষ্ট-২০০৮)

আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের বিজয় যাত্রা প্রত্যক্ষ করে বিধর্মীরাও যখন সত্যকে সনাক্ত করতে সক্ষম হচ্ছেন তখন আমরা, আমাদের স্বদেশবাসীকে বিনয়ের সাথে আহবান করছি তারাও সমাগত সত্য অনুধাবন করে দ্রুত খিলাফতে আহমদীয়ার সুশীতল ছায়ায় নিজেদের শামিল করুন।

আল্লাহতাআলা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আপামর বিশ্ববাসীকে ঐশী নিয়ামত–আহমদীয়া খিলাফতের ব্যবস্থাপনা –থেকে কল্যাণ লাভের তৌফিক দান করুন।

কুরআন শরীফ
সূরা হূদ-১১

৯। আর আমরা নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য তাদের কাছ থেকে (নির্ধারিত) আযাব (দূরে) সরিয়ে রাখলে তারা অবশ্যই বলবে, 'এটাকে কিসে বাধা দিয়ে রেখেছে?' শোন! যেদিন তাদের কাছে তা আসবে সেদিন তাদের কাছ থেকে তা কখনো সরানো হবে না এবং যে (আযাবের) বিষয়ে তারা উপহাস করতো তা তাদের ঘিরে ফেলবে।

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٩﴾

১০। আর আমরা মানুষকে আমাদের পক্ষ থেকে কৃপা আস্বাদন করানোর পর আমরা তার কাছ থেকে তা প্রত্যাহার করে নিলে নিশ্চয় সে অত্যন্ত নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ﴿١٠﴾

১১। আর কোন দুঃখকষ্টে জর্জরিত হওয়ার পর তাকে আমরা সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করালে সে অবশ্যই বলে ওঠে, 'আমার সব দুঃখ দূর হয়ে গেলো'। নিশ্চয় সে (সামান্যতেই) অতি উল্লসিত ও অত্যন্ত অহংকারী হয়ে ওঠে।

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ﴿١٠﴾

১২। তবে যারা ধৈর্য ধরে এবং সৎকাজ করে তাদের কথা ভিন্ন। এদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার।

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾

১৩। সুতরাং (কাফিররা আশা করে) তোমার প্রতি যেসব ওহী অবতীর্ণ করা হয় সম্ভবত[১৩০১] এর একাংশ তুমি পরিত্যাগ করবে। আর (তারা এ আশাও করে) তোমার অন্তর তাদের এ উক্তির জন্য সংকুচিত হবে যে 'কেন তার কাছে কোন ধনভান্ডার অবতীর্ণ করা হয় নি অথবা কোন ফিরিশ্‌তা[১৩০২] তার সাথে কেন আসে নি?' তুমি কেবল একজন সতর্ককারী। আর আল্লাহ্‌ সব বিষয়ের ওপর তত্ত্বাবধায়ক।

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٣﴾

১৩০১। 'লা'আল্লা' শব্দ প্রত্যাশা বা ভয় এ দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উক্ত অবস্থা বক্তা বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা অন্যান্যদের সম্পর্কিত হোক না কেন।

১৩০২। কুরআন শরীফের বাক্‌ভঙ্গির একটা বিশেষত্ব এই, কখনো প্রশ্নকে বাদ দিয়ে শুধু উত্তর প্রদান করা হয়েছে যার মাঝে অন্তর্নিহিত প্রশ্নটিও প্রকাশিত হয়ে থাকে। উল্লেখিত আয়াত এই ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষত্বের একটি প্রমাণ। পূর্ববর্তী আয়াতে মু'মিনদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল যে তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রয়েছে। এতে অবিশ্বাসীরা বিদ্রূপের সুরে রসূল করীম (সা.)কে প্রশ্ন করেছিল, মু'মিনদের জন্য প্রতিশ্রুত মহাপ্রতিদান কোথায়? আমরা তো কিছুই দেখি না। মু'মিনদের কথা বাদ দিলেও তুমি তো নিজেই একজন নিঃস্ব ব্যক্তি, যদিও তোমার অর্থের প্রয়োজন খুব বেশি, অথচ তোমাকে সাহায্য করার জন্য আকাশ থেকে কোন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হতেও দেখি না। তাদের এই বিদ্রূপের উত্তরে কুরআন উল্টা ব্যঙ্গোক্তির মাধ্যমে বলছে, 'ওহে! ভারী তো প্রশ্ন করে বসেছো, যেন সম্ভবত এর উত্তর দিতে পারবে না বলে সেই ভয়ে হে রসূল (সা.)! তুমি ঐশী বাণীর সেই অংশকেই গোপন করবে যাতে ইসলামের বিজয় ও উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে! এটাতো তাদের অলীক ও ব্যর্থ মনোবাঞ্ছা মাত্র। এটা কখনো পূর্ণ হবে না।'

হাদীস শরীফ
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম চরিত্র

• হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফা (রা.) বর্ণনা করেন, "হযরত রসূল করীম (সা.) কখনও বিধবা ও অভাবী লোকদের সাহচর্যকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন না এবং তাদেরকে এড়িয়েও চলতেন না। বরং তাদের অভাব মোচন করে দিতেন" (মুসনাদ, দারেমী)।

• হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, "হযরত রসূল করীম (সা.) কখনও কাউকে প্রহার করেননি, না কোন মহিলাকে, না কোন খাদেমকে যদিও তিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছেন। যদি তিনি কখনও কারও দ্বারা কষ্ট পেতেন তবুও তিনি তার প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র বর্ণিত পবিত্র স্থানসমূহকে অপবিত্র করা হ'ত তখন তিনি আল্লাহ্ তাআলার জন্যে এর প্রতিশোধ নিতেন" (মুসলিম)।

• হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, "রসূল করীম (সা.) স্বয়ং নিজ হাতে উটদেরকে খাবার খাওয়াতেন, ঘরের টুকিটাকি কাজ করতেন, জুতো ঠিক করতেন, কাপড় রিপু করতেন, ছাগলের দুধ দোহন করতেন, গোলামদের সাথে আহার করতেন এবং গম ভাঙ্গানোর সময় গোলামরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি তাদের সাহায্য করতেন। বাজার থেকে জিনিসপত্র ঘরে বহন করে নিয়ে যাওয়া তিনি হেয় মনে করতেন না। ধনী ও দরিদ্রের সঙ্গে একইভাবে মুসাফাহ্ (করমর্দন) করতেন। সর্ব প্রথম সালাম দিতেন। তিনি কোন নিমন্ত্রণকে অবজ্ঞা করতেন না যদিও বা সেই নিমন্ত্রণ শুধু মাত্র খেজুরের হ'ত। তিনি দুঃখীদের পরিত্রাণ দান করতেন। তিনি কোমল চরিত্রের (হৃদয়ের) অধিকারী ও দয়ালু ছিলেন। তাঁর আচার-ব্যবহার উত্তম ছিল এবং তিনি প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। তিনি হাসতেন, কিন্তু উচ্চস্বরে নয়। তিনি কখনও বিরক্ত হয়ে ভ্রুকুটি করতেন না। তিনি বিনয়ী ছিলেন; কিন্তু নীচমনা ছিলেন না। দানশীল ছিলেন, কিন্তু অপচয়ী ছিলেন না। তিনি কখনও পেট পুরে খেতেন না পাছে আলস্য অনুভব করেন এবং কখনও লোভের বশবর্তী হয়ে হাত প্রসারিত করেন নি" (মিশকাত)।

• হযরত আবু মূসা আল আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, "একদা হযরত আয়েশা (রা.) আমাদেরকে একটি মোটা সূতার চাদর ও কয়েকটি বস্ত্র দেখিয়ে বললেন, "আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) এ বস্ত্রগুলো পরিহিত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন" (বুখারী)।

মহান খোদা তাআলা আমাদের সবাইকে শ্রেষ্ঠ নবীর আদর্শ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

সঙ্গ্রহ ও অনুবাদ ঃ **মাওলানা সালেহ্ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী
হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)

......আমাকে জানানো হয়েছে, তাঁরা পুণ্যবান লোকদের অন্তভুক্ত ছিলেন, তাঁদেরকে যে কষ্ট দেয় সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কে কষ্ট দেয় এবং সে সীমালংঘনকারীদের অন্তভুক্ত। যে তাঁদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করে ও ক্রোধভরে গালি দেয় আর গালমন্দ করা পরিত্যাগ করে না, অশ্লীল আচরণ ও অপলাপ থেকে বিরত হয় না বরং তাঁদেরকে বিভিন্ন অন্যায় আত্মসাৎ আর শত্রুতার দায়ে অভিযুক্ত করে এমন মানুষ শুধু নিজ প্রাণের প্রতিই যুলুম করে এবং নিজ প্রভুর সাথেই শত্রুতা করে। সাহাবিরা নিশ্চয় নির্দোষ। সুতরাং এ বিষয়ে ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করতে যেও না। কেননা এটি সবচেয়ে বড় ধ্বংসের পথ। প্রত্যেক অভিসম্পাতকারীর নিজ সীমালংঘনের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং হিসাব-নিকাশ দিবসকে স্মরণ রেখে আল্লাহ্কে ভয় করা উচিত। সে মুহূর্তকে ভয় করা উচিত যখন পাপাচারীদের আক্ষেপ চরম পর্যায়ে পৌঁছুবে আর সীমালংঘনকারীদের চেহারা সুস্পষ্টভাবে দেখানো হবে। আল্লাহ্র কসম! তিনি, শায়খাইন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও উমর) এবং তৃতীয়জন অর্থাৎ হযরত যুন্নুরাঈন [অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.)]-কে ইসলামের দ্বার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-এর অগ্রসেনানী হবার সম্মানে ভূষিত করেছেন। সুতরাং যে তাঁদের পদমর্যাদাকে অস্বীকার করে, তাঁদের সত্যতাকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে, এবং তাঁদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করে না বরং তাঁদেরকে অপমান ও গালমন্দ করতে উদ্যত হয় এবং তাঁদের উপর নোংরা আক্রমণ করে আমি এমন ব্যক্তির অশুভ পরিণাম ও ঈমান নষ্ট হবার আশংকা করি। যারা তাঁদের কষ্ট দেয়, অভিসম্পাত বর্ষণ করে, ও তাঁদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে–পরিণতিতে এমন লোকদের হৃদয় কঠিন হয়ে যায় এবং তারা পরম করুণাময়ের ক্রোধভাজন হয়। এটি আমার বারবারের অভিজ্ঞতা এবং এ কথা আমি স্পষ্টভাবে বলেছি যে, এসব নেতৃবর্গের প্রতি শত্রুতা, সব কল্যাণের উৎস আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবার সবচেয়ে বড় কারণ। যে তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এমন মানুষের জন্য দয়া ও স্নেহের সব দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়, তার জন্য জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত করা হয় না। আল্লাহ্ তাআলা তাকে ইহজগতের মোহ ও ইহজাগতিক কামনা-বাসনার অধীনস্ত করে দেন এবং সে অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির ভয়াবহ খাদ ও গহ্বরে পতিত হয় যা তাকে বহুদূরে নিক্ষেপ করে, ফলে তার বোধবুদ্ধি লোপ পায়। তাঁদেরকে (অর্থাৎ প্রথম তিন খলীফাকে-অনুবাদক) নবীদের ন্যায় কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং রসূলদের মত অভিসম্পাত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তাঁরা যে রসূলদের উত্তরাধিকারী তা সাব্যস্ত হলো এবং যুগে যুগে আগত ইমামদের ন্যায় বিচার দিবসে তাঁদের পুরস্কারও অবধারিত হয়ে গেল। কেননা যদি কোন মু'মিনকে বিনা দোষে অভিসম্পাত করা হয়, কাফের আখ্যা দেয়া হয়, নোংরা নামে ডাকা হয় এবং অকারণে গালি দেয়া হয় তাহলে এমন মানুষ নবী ও মনোনীতদের সদৃশ হয়ে যান। তাঁকে নবীদের মত পুরস্কৃত করা হবে এবং তিনি রসূলদের মতই পুরস্কার পাবেন। সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা যে এক সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্মান ও মহিমার অধিকারী খোদার প্রশংসানুসারে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন এবং সব মনোনীত লোকের ন্যায় তাঁদেরকেও তিনি তাঁর ফিরিশ্তা দ্বারা সাহায্য করেছেন। ('সিররুল খিলাফাহ্' বাংলা সংস্করণ পৃঃ ২০-২১ থেকে উদ্ধৃত)

হযরত রসূল করীম (সা.) ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মেহমানদারীর পবিত্র ঘটনাবলীর চিত্তাকর্ষক বর্ণনা

আহমদীয়া জামাআতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে হুযূর (আই.)-এর মূল্যবান উপদেশ

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ -

[সৈয়্যদেনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক ১৮ জুলাই, ২০০৮ ইং মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডনে প্রদত্ত]

জলসার এক সপ্তাহ পূর্বের খুতবা, সাধারণত জলসায় আগত মেহমানদের ক্ষেত্রে মেযবানদের করণীয় বিষয়ে দিয়ে থাকি। মেযবানের এ দায়িত্ব জামাআতের ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকেও পালন করা হয়, আর ব্যক্তিগতভাবে আহমদীরাও তাদের আপনজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের ক্ষেত্রে পালন করে।

মেহমানদারী এমন এক গুণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যার সম্পর্কে কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটা নবীদের ও তাঁদের মান্যকারীদেরও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মেহমানদারী পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধিরও একটি মাধ্যম। এটা অন্যদের আকৃষ্ট করে কাছে নিয়ে আসে যার ফলে তবলীগের অনেক রাস্তা খুলে যায়। আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নতের মাঝেও আমরা মেহমানের সমাদরের ঘটনাবলী দেখতে পাই, আর তাঁর (সা.) গোলামে সাদেকের (প্রকৃত সেবক) জীবনীতেও এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধের ঘটনা দেখতে পাই।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে জানিয়েছেন তার নিকট অধিক হারে লোক আসতে থাকবে। আর এটা স্পষ্ট বিষয়, কোন অপরিচিত জায়গায় যখন কেউ আসে তখন মেহমান হয়েই সে আসে। এজন্য এ ইলহামও হয়েছে।

وَلَا تُصَعِّرْ لِخَلْقِ اللّٰهِ وَلَا تَسْئَمْ مِنَ النَّاسِ

আর যে লোকেরা তোমার নিকট আসবে, তোমার উচিত হবে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার না করা এবং তাদের সংখ্যা অধিক দেখে কষ্ট না পাওয়া।

সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ মেহমানদারী তো করারই ছিল। এটা নবীদের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এতে আমাদের জন্য উপদেশবাণী হচ্ছে-মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লঙ্গর সম্প্রসারিত হবে। এজন্য বিশেষভাবে ঐ কেন্দ্র যাতে যুগ খলীফা অবস্থান করবেন এবং এ ছাড়াও যেখানে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নামে লোকেরা একত্রিত হবে সেখানে মেহমানদারীর ব্যবস্থা নিতে হবে।

সেখানে এ সর্বোত্তম সেবা অর্থাৎ মেহমানদারীর কাজকে সামর্থ্যবান লোকেরা করতে যেন পিছপা না হয়। এ ভবিষ্যদ্বাণী জামাআতের সংখ্যা অধিক হারে বৃদ্ধির জন্যও প্রযোজ্য। আর শুধু সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই নয়, বরং জামাআতের সদস্যরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় অনেক বৃদ্ধি পাবে এজন্যও প্রযোজ্য। নিষ্ঠাবানগণের কেন্দ্রে আসা যাওয়া হতে থাকবে। যারা আসার তারা আসতে থাকবে। আর শুধুমাত্র মান্যকারীদের সংখ্যাই নয়, বরং সত্যান্বেষীদের এক বড় সংখ্যাও আসতে থাকবে। আর তাদের মেহমানদারী করতে হবে। এজন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লঙ্গর চালু করেছেন। আর এটাকেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে একটি কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লঙ্গর চলছে। যেখানেই জামাআতের কেন্দ্র সেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পয়গাম শুনার জন্য লোকদের আগমন হচ্ছে। আর যখন সালানা জলসা হয় তখন এর এক অন্য রকম দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং আমাদের উপর ন্যস্ত এ মেহমানদারী এমন এক কাজ যা সাধারণভাবে প্রত্যেক আহমদীর জন্য এবং যুগ খলীফা ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষভাবে ফরজ। আমি মনে করি এতে আমাদের জন্য একটা সতর্কবাণীও রয়েছে–যদি তোমরা এ সর্বোত্তম আখলাককে নিজের মাঝে ধারণ না কর তাহলে আল্লাহ্ তাআলার পুরস্কারাদি থেকে বঞ্চিত হবে। আর যদি এ সর্বোত্তম আখলাককে নিজেদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পার তাহলে এটা তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ও কৃপা অর্জনকারী বানাবে।

সুতরাং ঐ সমস্ত কর্মী, স্বেচ্ছা সেবক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা সৌভাগ্যবান যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মেহমানদের সেবার জন্য নিজেদের পেশ করেছেন। আর তাদের এ সুযোগও হয়েছে।

মেহমানদারী
এমন একটি মানবীয় উত্তম বৈশিষ্ট্য যা ধর্ম ও পার্থিবতা দু'দিক থেকেই অন্যদেরকে কাছে টানার কারণ হয়। আর এ যুগে যেহেতু ধর্মের পুনর্জাগরণের জন্য, বান্দাকে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে পরিচয় করানোর জন্য, আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য, উত্তম আখলাক প্রতিষ্ঠার জন্য, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে বয়স্ক পুরুষ-মহিলা, যুবক-যুবতী ও শিশুরাও জলসার দিনগুলোতে বিশেষ এক আবেগ নিয়ে মেহমানদের সেবা করার জন্য ও বিভিন্ন ডিউটির জন্য নিজেদের নাম পেশ করেন।

যেভাবে আমি অনেকবার বলেছি, এখন প্রত্যেক দেশে জলসা হয়। অনেক জলসায় আমিও অংশ গ্রহণ করি। আর আল্লাহ্ তাআলার ফযলে প্রত্যেক জাতির আহমদীরাই ডিউটির জন্য নিজেদেরকে পেশ করে থাকেন। আর তারা আনন্দের সাথে নিজেদের পেশ করেন। আফ্রিকার উদাহরণ আমি দিয়েছি তারা কেমন আনন্দের সাথে ডিউটি দিয়ে থাকেন। পরে আমেরিকা ও কানাডাতে জলসা হয়েছে। আর যেখানেই আমি গিয়েছি, যেখানেই জলসা হয়েছে, সেখানেই প্রত্যেক শ্রেণীর লোক, সকল বয়সের লোক মেহমানদের সেবার জন্য নিজেদেরকে পেশ করেছেন। আর অত্যন্ত আনন্দের সাথে ডিউটি দিয়েছে।

কিন্তু UK জলসার এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এখানে ব্যবস্থাপনা সুপ্রসারিত। আর খিলাফতের বিদ্যমানতার কারণে বিশ্বের অন্য জায়গার তুলনায় এটা এখানে বেশিই রয়েছে। মানুষের দৃষ্টিও এই জলসার উপর সবচে বেশি রয়েছে। এটা নিজেদেরও আর অন্যদেরও। এজন্য যারা ডিউটি দেন, তাদের জন্য কিছু ডিউটি স্পর্শকাতর হয়। যেভাবে আমি পূর্বে কয়েকবার বলেছি, এ জলসা ঢাকঢোল না পিটিয়েই আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করেছে। এজন্য আমার বেশি চিন্তা এ জলসাকে কেন্দ্র করেই রয়েছে। আর লোকদের প্রত্যাশাও অনেক বেশি। বিশেষভাবে ঐ লোকদের যারা বাইরের দেশ থেকে আসেন। যারা অন্য দেশ থেকে মেহমান হয়ে আসেন। প্রসঙ্গক্রমে আমি এখানে এটাও বলে দিচ্ছি–বর্তমানে খিলাফতের কেন্দ্র এখানে হওয়ার কারণে লন্ডনের খোদ্দামরা ও অন্যান্য কর্মীরা নিরাপত্তার ডিউটি দেন বা স্থায়ী লঙ্গরের ডিউটি দেন বা অন্য অনুষ্ঠানেও

নিজেদের পেশ করেন। আর অনুষ্ঠানও ব্যাপকহারে হচ্ছে। অন্যান্য দেশের জামাআতের সদস্যদের তুলনায় এখানকার লোকেরা অনেক বেশি সময় ধরে কাজ করে থাকেন। আর গত ২৪ বছর যাবৎ অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। রাবওয়া ও কাদিয়ানে তো এ কাজের জন্য স্থায়ী কর্মচারী রয়েছে। কিন্তু এখানে লঙ্গরেরও অনেক বড় অংশ এবং মসজিদ ফযলের বিভিন্ন ডিউটি আল্লাহ্ তাআলার ফযলে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আনসারুল্লাহ্র স্বেচ্ছাসেবকগণ করে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সবাইকে এ সেবার অতি উত্তম প্রতিদান দিন। কর্মীরা এ দেশে অবস্থান করে আর বিশেষভাবে এ এক্সপেনসিভ শহরে অবস্থান করে নিজের সময় ও অর্থ কুরবানী করে যাচ্ছে, এটা নিঃসন্দেহে জামাআত ও খিলাফতের প্রতি তাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সম্পর্কের কারণেই হচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ভবিষ্যতেও এ তৌফিক দিতে থাকুন।

জামাআতের জলসা ও এর লঙ্গরের চলমান ব্যবস্থাপনা দেখে অন্যরাও অনেক অভিভূত হন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগেও যে লোক কাদিয়ানে আসতো সে অভিভূত হতো। জামাআত বহির্ভূত অনেক লোক এই লঙ্গরের ব্যবস্থাপনা ও মেহমানদারী দেখে, বিশেষ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মেহমানদারী দেখে খুবই অভিভূত হতো। বর্তমানেও জলসাগুলোতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চালু করা লঙ্গরের ব্যবস্থাপনা লোকদেরকে অভিভূত করছে।

এবার যখন আমি আফ্রিকা সফরে গেলাম কয়েকটি দেশ যেখানে জলসা হয়েছে সেখানে খিলাফত জুবিলীর কারণে লোক সমাগম অনেক বেশি হয়েছে। তাই এতো মেহমানের খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে এটা দেখে অনেক জামাআত বহির্ভূত লোক, যারা জলসায় এসেছিলেন তারা অভিভূত হয়েছে। তারা তাদের বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। অনেকে তো এ বিষয়টিকে জামাআত খোদার পক্ষ থেকে এর দলিল হিসেবেই মনে করেছেন। তারা এমন মেহমানদারী কোথাও দেখেন নি। মূলতঃ এ সবকিছু আঁ হযরত (সা.)-এর গোলামে সাদেক (সত্যিকার সেবক)-এর তরবীয়তের কারণেই হয়েছে, যিনি নিজে আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শের উপর পরিচালিত হয়ে আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়েছেন।

তিনি (আ.) বলেন, আমার সর্বদা খেয়াল থাকে মেহমানদের যেন কোন কষ্ট না হয়। বরং এজন্য সর্বদা তাকিদ দিতে থাকি, যতটুকু সম্ভব হয় মেহমানদের আরাম দেয়া হোক। মেহমানদের হৃদয় আয়নার মত নাজুক হয়ে থাকে। কাচের মত নাজুক হয়। সামান্য আঘাত লাগলেই তা ভেঙ্গে যায়।

আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে এটা তাঁর মেহমানদারী ও বদান্যতা ছিল যার কারণে কিছু অস্বীকারকারীরও সত্যকে মানার তৌফিক হয়েছিল। সুতরাং মেহমানদারী এমন একটি মানবীয় উত্তম বৈশিষ্ট্য যা ধর্ম ও পার্থিবতা দু'দিক থেকেই অন্যদেরকে কাছে টানার কারণ হয়। আর এ যুগে যেহেতু ধর্মের পুনর্জাগরণের জন্য, বান্দাকে তার সৃষ্টিকর্তার সাথে পরিচয় করানোর জন্য, আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য, উত্তম আখলাক প্রতিষ্ঠার জন্য, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। আর তাঁকে (আ.)-এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন–**ম্যাঁ তেরি তবলীগ কো জমিন কে কিনারোঁ তাক পৌঁহ্চাঁউঙ্গা–** আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো। অর্থাৎ যেসব কাজ মসীহ্ ও মাহদীর উপর ন্যস্ত ছিল তা মূলতঃ তাঁর (আ.) ও তাঁর (আ.) পর নেযামে খিলাফতের মাধ্যমে পূর্ণ হবে। কিন্তু হৃদয়গুলোকে ফিরানোর শক্তি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও নেই। এজন্য প্রকৃত পক্ষে এ কাজ খোদা তাআলাই করেন, করে যাচ্ছেন, করছেন। আর আল্লাহ্ তাআলার এ শক্তিশালী সাহায্য ও সমর্থনের কারণেই আল্লাহ্ তাআলা বলছেন, এমনই হবে, যখন হৃদয়গুলোকে আকৃষ্ট করে দেয়া হবে তখন লোকেরা আসবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপর ইলহাম হয়েছে-

يَأْتُوْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ

অর্থাৎ লোকেরা দূরদূরান্ত থেকে তোমার নিকট আসবে। অতএব আল্লাহ্ তাআলা যখন ধর্ম গ্রহণকারীদেরকে, ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনকারীদেরকে, ও ধর্মের গবেষণাকারীদেরকে পাঠাতে থাকবেন তখন ভয় পাবে না। উত্তম আখ্লাকে বহির্প্রকাশ ঘটিয়ে তাদের মেহমানদারীতে কোন ত্রুটি করবে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নিকট আগত মেহমানদের এ রকমই গুরুত্ব ছিল। জলসার প্রতিষ্ঠা এজন্যই করেছেন যেন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতি হয় আর এজন্য লোক একত্রিত হয়।

অতএব, এ মেহমান যারা জলসার জন্য আসেন এবং আসছেন তাদের প্রত্যেক ধরনের সেবা করা প্রত্যেক কর্মীর জন্য আবশ্যক। আর যারা বিভিন্ন সেকশনে ডিউটির জন্য নিজেদের পেশ করেছেন তাদের উচিত পুরা মনোযোগ দিয়ে ডিউটি দেয়া। এ মেহমান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্য আসছেন। আর আমি যেভাবে বলেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন, তাদেরকে দেখে যেন আমরা ভয় না পাই এবং মন্দ ব্যবহার প্রদর্শন না করি।

আমরা আঁ হযরত (সা.) এর উত্তম জীবনাদর্শে মেহমানদারীর অতি আশ্চর্য দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। এখন দেখুন কেমন মহান দৃষ্টান্ত! মেহমান বিছানা নষ্ট করে চলে গেছে। আর তিনি (সা.) নিজের হাতে সেটা পরিষ্কার করছেন। নাজ্জাশীর প্রেরিত প্রতিনিধির সেবা তিনি নিজ হাতে করছেন। সাহাবাগণ (রা.) এগিয়ে এসে বলেছেন আমাদেরকে কাজ করতে দিন, সুযোগ দিন, আপনি কেন কষ্ট করছেন? তখন আঁ হযরত (সা.) উত্তর দিলেন তারা মুসলমানদের যে সম্মান প্রদর্শন ও সেবা করেছে, এর প্রেক্ষিতে এখন আমার জন্য আবশ্যকীয় আমি যেন নিজ হাতে তাদের সেবা করি। আবার এক মেহমান আসলো, এক ছাগীর দুধ পুরোটা পান করে নিল। আরও চাইলো। তিনি দিতে থাকলেন। এমন কি ৭ ছাগীর দুধ পান করে নিল। কিন্তু তিনি (সা.) এটা বলেন নি, তুমি এ কি করছো! এটা তোমার পেট না অন্য কিছু? বরং তিনি দিয়েই যেতে লাগলেন!

সাহাবাদের এমনভাবে তরবীয়ত করলেন, গৃহবাসীরা মেহমানের মেহমানদারীর জন্য নিজ শিশু সন্তানদের ক্ষুধার্ত রেখে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। খাবার কম, তাই কৌশলে বাতি নিভিয়ে অন্ধকার করে নিজেরাও খাবার খাচ্ছেন বলে ভান করে যেতেন। মুখ থেকে এমন শব্দ বের করতেন যাতে মেহমানের মনে হতো তারা মেহমানের সাথেই খাচ্ছেন। আর এ মেহমানদারী খোদার এতই পছন্দ হতো আরশে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে খোদাও হাসতেন। আর আঁ হযরত (সা.) কে তাঁর (সা.) ঐ কুরবানীকারী সেবকের এ কর্মের খবর জানিয়ে দিতেন।

আবার সাহাবাদের মেহমানদারীর দৃষ্টান্তও এক দুই দিনের মেহমানদারীর নয়, বরং মুহাজিরগণ যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন আনসারগণ মেহমানদের স্বাগত জানিয়ে তাদেরকে সম্পদের অংশীদার বানিয়ে দেন। এ ঘটনাকে খোদা তাআলা প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখে বলছেন

يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

(সূরা হাশর-১০)

অর্থাৎ নিজের প্রাণের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এমন নয় অন্যের জন্য এ কুরবানী (ত্যাগ) তারা নিজেরা খুবই স্বাচ্ছন্দে ও ভাল অবস্থায় ছিলেন এ জন্য ছিল, তাই অন্যকে সম্পদ দিয়ে দিয়েছেন। বরং নিজেরা অভাব অনটনে থেকেই ত্যাগের (কুরবানীর) মানসিকতায় এ সেবা করেছেন। **রুহামায়ূ বাইনাহুম** অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত-এ দৃশ্য সর্বদা আমাদের দৃষ্টিতে আসে। নিজের ভাইয়ের সেবা করে তারা আনন্দিত হতেন।

অতএব, যেভাবে আমি বলেছি মেহমানগণ বিশেষ করে UK-এর জলসায় খিলাফতের প্রতি ভালবাসার কারণে ও ধর্ম শিখার জন্য আসেন। এ জন্য তাদের সেবা করা আমাদের জন্য ফরয (আবশ্যকীয়)। প্রত্যেকের সাথে কোমল ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করা আমাদের জন্য আবশ্যক। অনেক লোক প্রথম বারের মত পাকিস্তান ও আফ্রিকার দেশগুলো থেকে এসে থাকেন। আবার বিভিন্ন জাতির লোকেরা এসে থাকেন। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার প্রদর্শন করা ও তাদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখা এটা আমাদের জন্য আবশ্যকীয়। ধনী গরীব যেই হোন না কেন সবাইকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মেহমান মনে করে সেবা করা উচিত। এ বছর খিলাফতের শতবর্ষ পূর্তি হওয়ার কারণে মেহমানের সমাগমও অনেক বেশি হবে। এজন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে পূর্ব থেকে আরও উন্নত করা হয়েছে। কর্মীদেরও নিষ্ঠায় পূর্বের চেয়ে অগ্রসর হয়ে এই ব্যবস্থাপনাকে সফল করার চেষ্টা করা উচিত। ব্যবস্থাপত্র যত ইচ্ছে থাক, কিন্তু কর্মীরা সঠিকভাবে কাজ না করলে সবই ভেস্তে যাবে। যে খুশি ও আবেগের সাথে মেহমানরা এখানে আসছেন সেভাবেই পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের তাদেরকে স্বাগত জানানো উচিত। আর সর্বদা তাদের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকা

উচিত। অতএব, মসীহ ও মাহদীর খিলাফতের ১০০ বছর পূর্তিতে কর্মীরাও নিজেদের মাঝে পূর্বের চেয়ে অধিক সেবা করার আবেগ ও স্পৃহা সৃষ্টি করুন। আবার ঐ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর মেহমানদের ক্ষেত্রে করতেন। তিনি (আ.) এ যুগে যে আদর্শ আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, সেটা তাঁর (আ.) জীবনাদর্শের এক অতি উত্তম দিক। এরই উদ্ধৃতিতে আমি তাঁর জীবনির কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরতে চাই।

মেহমানদের সমাদর ও আপ্যায়নের ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উপদেশ দিয়েছেন–"লঙ্গরের ব্যবস্থাপককে যেন জোড়ালো নির্দেশ দেয় যাতে তিনি প্রত্যেকের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু তারপরও যেহেতু তিনি একা মানুষ, আর কাজ অনেক বেশি। তাই হতে পারে তিনি ভুলে যান। এজন্য দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন"।

এখন তো আল্লাহ্ তাআলার ফযলে অনেক বিস্তৃত ব্যবস্থাপনা। স্থায়ী ও অস্থায়ী দু'ধরনের কর্মীই রয়েছেন। এজন্য কোন ধরনের ঘাটতি থাকা উচিত নয়।

তিনি (আ.) আবার বলছেন–"কারও ময়লা কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দেখে তার আপ্যায়নে অবহেলা করা উচিত নয়। কেননা সব মেহমান একই রকম হয়ে থাকেন। আর যিনি নব পরিচিত লোক তার ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব তার সব প্রয়োজনের দিকেই দৃষ্টি রাখা। অনেক সময় টয়লেট কোথায় কারও জানা থাকে না, ফলে তার অনেক কষ্ট হয়। এজন্য আবশ্যক মেহমানদের যাবতীয় প্রয়োজনের দিকে যেন দৃষ্টি রাখা হয়। আমি তো প্রায়ই অসুস্থ থাকি (এটা তার শেষ জীবনের নসিহত ছিল), এজন্য অপারগ। কিন্তু যে ব্যক্তিকে এ কাজের জন্য স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে তার জন্য আবশ্যক তিনি যেন কোন ধরনের অভিযোগ উঠতে না দেন। কেননা লোকেরা শত শত ও হাজার ক্রোশ পথ অতিক্রম করে সত্যান্বেষণ ও নিষ্ঠার মনোভাব নিয়ে সত্যকে পরখ করার জন্য এখানে আসেন। আর এখানে এসে যদি কষ্ট হয় তাহলে হতে পারে তিনি এতে দুঃখ পাবেন। আর দুঃখ থেকে আপত্তির জন্ম হতে পারে। এভাবে যদি তিনি পরীক্ষায় নিপতিত হন তাহলে এ গুনাহ্ মেযবানের স্কন্ধে ন্যস্ত হবে"।

(মলফুযাত, চতুর্থ খন্ড, পৃ-১৭০, নতুন সংস্করণ)

অতএব, যেভাবে আমি বলেছি–এবার বিভিন্ন জাতির লোকেরা এখানে আসছেন। আর অধিক সংখ্যায় আসছেন। তাদের অনেকে একদম প্রথম বার আসছেন। আবার অনেক মেহমান রয়েছেন যারা আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশ থেকে বড় সংখ্যায় আসছেন, যারা আহমদীও নন। তাদের সবার মেহমানদারী ও তাদের আবেগ অনুভূতির দিকে দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক কর্মীর আবশ্যক। আল্লাহ্র ফযলে অন্যরা সব সময়ই এখানকার ব্যবস্থাপনা দেখে অভিভূত হয়ে থাকেন। যেটা বিগত বছরগুলোতে এখানে হয়েছে। অন্যরা যখনই আসেন তারা অভিভূত হন। এ বছর বেশি চিন্তা এ জন্যই কেননা সংখ্যা অনেক বেশি হবে, আর ধারণা এরূপই। কিন্তু এ সংখ্যার কারণে ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য হওয়া উচিত নয়।

আবার, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট মেহমানদের ব্যবস্থাপত্র ও মেহমানদারীর উল্লেখ করা হলে তিনি (আ.) বলেন, "আমার সর্বদা খেয়াল থাকে মেহমানদের যেন কোন কষ্ট না হয়। বরং এজন্য সর্বদা তাগিদ দিতে থাকি, যতটুকু সম্ভব হয় মেহমানদের আরাম দেয়া হোক। মেহমানদের হৃদয় আয়নার মত নাজুক হয়ে থাকে। কাঁচের মত নাজুক হয়। সামান্য আঘাত লাগলেই তা ভেঙ্গে যায়। এজন্য অনেক পূর্বেই আমি এ ব্যবস্থা নিয়েছিলাম যে, আমি নিজে মেহমানদের সাথে খাবার খেতাম। কিন্তু যখন অসুস্থতা বেড়ে গেল, আর খাবারের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা চলে আসলো তখন এ ব্যবস্থার ইতি ঘটেছে। সেই সাথে মেহমানদের সংখ্যা এতো অধিক হয়ে গেল যে, জায়গাও সংকুলান হতো না। ফলে নিরুপায় হয়ে আমাকে পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলো। আমাদের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে অনুমতি দেয়া আছে আপনারা আপনাদের কষ্টের কথা অবহিত করুন। অনেকে অসুস্থ থাকেন তাদের জন্য পৃথক খাবারের ব্যবস্থা হতে পারে।

(মলফুযাত, তৃতীয় খন্ড, পৃ-২৯২, নতুন সংস্করণ)

আজ যদিও প্রত্যেক জাতির জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা নেই তবুও আল্লাহ্ তাআলার ফযলে ভিন্ন ধরনের দুই তিন প্রকার খাবার রান্না হয়। কিন্তু যারা খাবার পরিবেশন করে, যারা মেহমানদারী করে তাদের জন্য

আবশ্যক তারা যেন তাদেরকে তাদের রুচি অনুযায়ী খাবার পরিবেশন করেন।

হযরত মৌলভী হাসান আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন (এটা তার বয়আতের পূর্বের ঘটনা, তিনি ১৮৮৭ সালে প্রথমবার কাদিয়ানে গিয়েছিলেন), "মির্যা সাহেবের মেহমানদারী দেখে আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। এক ছোট ঘটনা লিখছি–যা থেকে পাঠকগণ তাঁর মেহমানদারীর বিষয়ে ধারণা করতে পারবেন। তিনি বলছেন, আমার পান খাওয়ার খুবই অভ্যাস ছিল। অমৃতসরে তো আমি পান পেয়েছি। কিন্তু বাটালায় আমি কোথাও পান পাইনি। অপারগ হয়ে এলাচি ইত্যাদি খেয়েই ধৈর্য ধারণ করি। আমার অমৃতসরের বন্ধু হযরত মির্যা সাহেবকে আমার অজান্তে কোন এক সময়ে আমার বদ অভ্যাসের কথা জানিয়ে দেন। জনাব মির্যা সাহেব এক ব্যক্তিকে গুরুদাসপুর পাঠালেন। দ্বিতীয় দিন এগারটার সময়ে যখন খাবার খেয়ে শেষ করলাম তখন পান দেখতে পেলাম। ষোল ক্রোশ দূর থেকে আমার জন্য পান নিয়ে আসা হয়েছে।

(সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), লেখক ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.), প্রথম খন্ড পৃ-১৩৫-১৩৬)

অমৃতসর সেখান থেকে ১৬ মাইল দূরে ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেখান থেকে তাঁর জন্য পান আনিয়ে নিলেন। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁকে এটাও বলেছিলেন দ্বিতীয়বার আসবেন। সুতরাং তিনি নেক স্বভাব ও সৌভাগ্যবান ছিলেন। ১৮৯৪ সালে দ্বিতীয়বার কাদিয়ানে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত নেন। কেননা প্রথমবার যখন এসেছিলেন তখন ঐ সময়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বয়আত নেয়া শুরুই করেন নি।

একটা বর্ণনা হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) সাহেব মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানওয়ারী সাহেব এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বায়তুল ফিকিরে (মসজিদে মোবারকের সাথের কামরা যা হুযূরের ঘরের অংশ ছিল) শুয়ে ছিলেন। আর আমি পা টিপছিলাম। তখন লালা শরমপত বা হতে পারে লালা মালওমাল কামরার দরজার কড়া নাড়লেন। আমি উঠে দরজা খুলতে গেলাম। কিন্তু হযরত সাহেব অতি দ্রুত উঠে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে গিয়ে ছিটকানি খুলে দিলেন। আর ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসলেন। আর বললেন, আপনি আমাদের মেহমান, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, মেহমানের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।"

(সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), লেখক ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.), প্রথম খন্ড পৃ-১৬০)

এ ঘটনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিনয় প্রদর্শনের এক উত্তম দৃষ্টান্ত। মেহমানকে সম্মান প্রদর্শনের এক উত্তম দৃষ্টান্ত। বাহ্যত এটা এক ছোট্ট বিষয়। কিন্তু নেতা তাঁর নিজের শিষ্যকে যে সম্মান প্রদর্শন করলেন এটা শুধু মাত্র আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশ ও আদর্শের উপর আমল করার জন্য করেছেন। আর এটা এক সত্যিকার প্রেমিকই করতে পারে। আর এমন সত্যিকার প্রেমিক তিনি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ অপবাদ দেয়া হয় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেকে আঁ হযরত (সা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। (নায়ুযুবিল্লাহ্)

একবার কপুরথলার বেগুয়াল গ্রামের এক ব্যক্তি নিজের কোন আত্মীয়ের চিকিৎসার জন্য আসলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এটা জানতে পারলেন। তিনি (আ.) তাৎক্ষণিক তার জন্য অতি উত্তম থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। আর অত্যন্ত সহানুভূতি ও ভালবাসার সাথে তার রোগীর খোঁজখবর নিতেন। সেই সাথে হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব খলীফাতুল আওওয়াল (রা.)কেও বিশেষভাবে নির্দেশ দেন। তখন তিনি এটাও উল্লেখ করলেন, শিখদের শাসন আমলে একবার আমাদের পূর্ব পুরুষদের বেগুওয়াল যেতে হয়েছিল। এজন্য এ গ্রামের লোকদের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এরপরও যখনই ঐ গ্রামের কোন লোক এসেছে তার সাথে বিশেষ ভালবাসার ব্যবহার প্রদর্শন করা হতো।

এখানেও আমাদের সেই আদর্শ বাস্তবায়নের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। যে আদর্শ তাঁর নেতা ও মুর্শিদ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) নাজ্জাশীর প্রতিনিধিদের সাথে প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি (সা.) এজন্য তাদের সেবা করেছিলেন যে তারা মুসলমানদের সাথে উত্তম ব্যবহার প্রদর্শন করেছিল।

হযরত মীর হামেদ আলী সাহেব সিয়ালকোটি (রা.) একবার তাঁর (আ.) সত্তা সম্পর্কে বলছেন–"প্রথমিক যুগের ঘটনা, একবার (এ ঘটনা দীর্ঘ) এই নগণ্য ব্যক্তি হুযূরের খেদমতে কাদিয়ানে কিছুদিন অবস্থানের পর বিদায় নেওয়ার জন্য আবেদন করলাম। হুযূর বাড়ির ভিতরে অবস্থান করতেন। হুযূর দয়া ও করুণা করে

সেবকদের অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন ভেতরে যাওয়ার। আমি অনুমতির জন্য ভিতরে সংবাদ পাঠালাম। অন্য সদস্যরাও হুযূর বাহিরে আসবেন এটা শুনে এদিক ওদিক থেকে জড়ো হয়ে গেল। এমন কি হযরত সৈয়্যদনা মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেবও আসলেন। আর জামাআতের সদস্যরা একত্রিত হয়ে গেলেন। আমরা সবাই কিছুক্ষণ অপেক্ষায় ছিলাম হুযূর ভেতর থেকে বাহিরে চলে আসলেন। কি দেখলাম, হযূরের হাতে দুধ পূর্ণ এক পাত্র রয়েছে। আর সম্ভবত গ্লাস মিয়া সাহেবের হাতে ছিল। আর চিনি রুমালে রয়েছে। [অর্থাৎ হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর (আ.) সাথে ছিলেন। ছোট শিশু ছিলেন।] হুযূর (আ.) গোল কামরার পূর্ব গলি দিয়ে বের হয়েই বললেন, শাহ সাহেব কোথায়? আমি সামনে উপস্থিত ছিলাম, তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হলাম, আর বললাম হুযূর উপস্থিত। হুযূর দাঁড়িয়ে গেলেন আর আমাকে বললেন, বসে যাও। আমি তখনই ভূমিতে বসে গেলাম। তিনি এটাও বলেলেন, খাওয়া বা পান করার সময় বসে পান করা উচিত। বা আরামের সাথে খাওয়া উচিত। তারপর হুযূর (আ.) গ্লাসে দুধ ঢাললেন আর চিনি মিশালেন। আমার এটা স্মরণ নেই হযরত মাহমুদ আমার হাতে দুধ ভর্তি গ্লাস দিয়েছিলেন না হযূর (আ.)।

শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন যিনি লিখক। তিনি লিখছেন–আমার চোখ এখনও ঐ প্রভাব সৃষ্টিকারী দৃশ্য দেখছে, একটি বড় গ্লাস হযরত সাহেবের হাত থেকে মীর সাহেবকে দেয়া হচ্ছিল। এ দৃশ্য আমার এখনও স্মরণে আছে।

মোট কথা তিনি বলছেন, "সম্ভবতঃ হযরত মাহমুদই ঐ দয়ার্দ্র ব্যবহারের সাথে শরীক ছিলেন। আর হুযূর (আ.) চিনি গুলে গ্লাসে দুধ ঢালছিলেন এবং ভালভাবে নেড়ে চেড়ে আমাকে পান করার জন্য দিচ্ছিলেন। কিছু বন্ধু নিজেরা এ কাজ করতে চাইলেন। কিন্তু হুযূর বললেন, না না, কোন অসুবিধা নেই, আমি নিজেই করবো। যখন শাহ সাহেব গ্লাসের দুধ পান করে নিলেন তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দ্বিতীয়বার গ্লাসে দুধ ভরে দিলেন। তিনি বলেন, আমি সেটাও পান করে নিলাম। গ্লাস বড় থাকায় আমার পেট ভরে গেল। তারপর এভাবে তৃতীয়বার গ্লাস পূর্ণ করা হলো। আমি খুবই লজ্জিত হয়ে নিবেদন করলাম, হুযূর এখন তো পেট ভরে গেছে। বললেন, আর এক গ্লাস পান করে নাও। আমি ঐ তৃতীয় গ্লাসও পান করে নিলাম। তারপর নিজের পকেট থেকে কিছু বিস্কুট বের করলেন, আর বললেন, রেখে দাও, রাস্তায় ক্ষিদে পেলে খাবে। আমি তা পকেটে রেখে দিলাম। আর যে দুধ বেচে গেল সেটা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ভিতরে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। তিনি বলেন, আমি বল্লাম হুযূর এখন আমি সওয়ারী হয়ে যাবো, এক্কা গাড়ী সওয়ারীর জন্য প্রস্তুত। আপনি আর কষ্ট করবেন না। হুযূর (আ.) বললেন, সাথে যাবো। আর আমাকে সাথে নিয়ে চলতে লাগলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাথে একটা দলও চলছিল। রাস্তায় ধর্মের ও জ্ঞানের কথা হচ্ছিল। অনেক দূর পর্যন্ত চলে আসলেন। তিনি বলছেন, তখন আমাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রা.) কানে কানে এসে বললেন সামনে অগ্রসর হয়ে হুযূরের সমীপে আবেদন কর, আর বিদায় নাও। যদি তুমি অনুমতি না নাও, তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এভাবে তোমার সাথে সাথে চলতেই থাকবেন। তিনি বলেন, এতে আমি সামনে এসে অনুমতি নেই, তখন অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্তে ও হাস্যোজ্জ্বল ভাবে বললেন, ঠিক আছে, আমাদের সামনেই সওয়ারী হয়ে যাও। এতে আমি এক্কা গাড়িতে উঠে বসে গেলাম, আর হুযূর (আ.) ফেরৎ রওয়ানা হলেন।

(সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), লেখক ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.), পৃ-১৩৬-১৩৯)

একবার মুন্সী আব্দুল হক সাহেবের সাথে তিনি (আ.) পদব্রজে ছিলেন। ফেরৎ আসার সময় বললেন, "আপনি মেহমান। আপনার যে জিনিসের প্রয়োজন হবে আমাদেরকে নিঃসংকোচে বলবেন। কেননা আমি তো ভিতরে থাকি, আর বুঝতে পারি না কখন কার কি জিনিসের প্রয়োজন! বর্তমানে মেহমানের আধিক্যের কারণে অনেক সময় সেবকরাও অবহেলা করতে পারে। আপনি যদি মুখে বলা পছন্দ না করেন, তাহলে আমাকে লিখে পাঠাবেন। মেহমানদারী তো আমার জন্য ফরয (আবশ্যকীয়)।"

(সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), লেখক ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.), পৃ-১৪২)

মুফতী সাদেক সাহেব (রা.) লিখেন, আমার স্মরণ আছে, একবার আমি

লাহোর থেকে কাদিয়ানে এসেছিলাম। সম্ভবত ১৮৯৭ বা ১৮৯৮ এর ঘটনা হবে। আমাকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মসজিদ মোবারকে বসালেন, যা ঐ সময় খুবই ছোট ছিল। বললেন, আপনি বসুন, আমি আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসছি। এটা বলে তিনি ভিতরে চলে গেলেন। আমি ভাবলাম কোন সেবকের হাতে খাবার পাঠিয়ে দিবেন। কিন্তু কয়েক মিনিট পর যখন দরজা খুললো আমি কী দেখলাম! তিনি নিজের হাতে এক ট্রেতে প্লেট ও খাবার নিয়ে উপস্থিত হলেন। আমাকে দেখে বললেন, আপনি খাবার খান, আমি পানি নিয়ে আসছি। স্বতঃপ্রবৃত্ত আবেগে আপ্লুত হয়ে আমার চোখে অশ্রু এসে গেল। হুযূর আমাদের ইমাম ও নেতা হয়ে আমাদের এতো সেবা করছেন। তাহলে আমাদের পরস্পরের কেমন সেবা করা উচিত।

(যিকরে হাবীব, পৃ-৩২৭, লেখক হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.))।

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার জলসা সালানায় অনেক লোক একত্রিত হয়েছিলেন, যাদের কাছে কোন গরম কাপড় ছিল না। বিছানা, লেপ তোষক ইত্যাদি কিছুই ছিল না। বাটালা নিবাসী নবী বক্স নামীয় এক ব্যক্তি ভিতরে লেপ ও বিছানা ইত্যাদি চেয়ে পাঠানো শুরু করলো, আর মেহমানদেরকে তা দিতে থাকলো। তিনি বলেন, এশার নামাযের পর হুযূরের সমীপে উপস্থিত হই। দেখি তিনি (আ.) বগলে হাত রেখে বসে আছেন। আর তাঁর এক ছেলে, যিনি সম্ভবত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী ছিলেন, পাশে শুয়ে আছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি আচকান তার উপরে ছিল। খবর নেওয়ার পর জানতে পারলাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের লেপ, বিছানা সবকিছু মেহমানদের চাওয়াতে দিয়ে দিয়েছেন। আমি তখন নিবেদন করলাম–হুযূরের নিকট তো কোন কাপড়ের টুকরাও নেই আর শীতও অনেক বেশি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, 'মেহমানদের কোন কষ্ট হওয়া উচিত নয়। আমাদের আর কী, রাত তো চলেই যাবে। নীচে এসে আমি নবী বকশ নামবরদার কে ভর্ৎসনা করতে লাগলাম, তুমি হুযূরের লেপ ও বিছানাপত্রও নিয়ে এসেছ। তিনি লজ্জিত হলেন, আর বলতে লাগলেন, যাকে দিয়েছি এখন তার নিকট থেকে ফেরৎ কিভাবে নিব? তিনি বলছেন, পরে আমি মুফতী ফযলুর রহমান বা অন্য কারও কাছ থেকে যা সঠিক মনে নেই, লেপ ও বিছানাপত্র নিয়ে আসলাম। তখন তিনি (আ.) অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, অন্য কোন মেহমানকে দিয়ে দাও। আমার তো অধিকাংশ সময় ঘুমই আসে না। আমার চাপাচাপিতেও তিনি শেষ পর্য্যন্ত তা নিলেন না। বললেন, অন্য কোন মেহমানকে দিয়ে দাও।

(আসহাবে আহমদ. খন্ড ৪, পৃ-১৮০)

> ***মেহমানদের সমাদর ও আপ্যায়নের ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উপদেশ দিয়েছেন–"লঙ্গরের ব্যবস্থাপককে যেন জোরালো নির্দেশ দেয় যাতে তিনি প্রত্যেকের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু তারপর যেহেতু তিনি একা মানুষ, আর কাজ অনেক বেশি। তাই হতে পারে তিনি ভুলে যান। এজন্য দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন।***

হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) লিখেন সম্ভবতঃ আমি প্রথমবার ১৮৯৩ সালের মার্চ মাসের শেষ দিকে কাদিয়ানে আসি। রমযানের শুরু ছিল। লোকেরা ঐ সময় সেহরী খেতে উঠছিল। মেহমানখানার জন্য ছিল শুধু মাত্র দুটি কুঠি ও একটি দালান। অর্থাৎ পুরো লঙ্গরখানা আর দারুয্ যিয়াফত কুঠিতে ছিল। আর এর একটা আঙ্গিনা ছিল যাতে ডিসপেনসারী ছিল। এ ডিসপেনসারী যেখানে ছিল সেখান থেকে বাকি মেহমানখানা পর্যন্ত এক খোলা প্লেটফর্ম ছিল। হযরত হাফেয হামেদ আলী মরহুম সাহেব জানতে পারলেন–কোন মেহমান এসেছেন। ঐ সময়ে মেহমানখানার পরিচালক বলুন বা তত্ত্বধায়ক বলুন বা ইনচার্জ বলুন তিনিই ছিলেন। আর তিনি আমাকে চিনতেন। যখন তিনি সাক্ষাৎ করলেন, তখন ভালবাসা ও সহমর্মিতার সাথে মুসাফা করলেন ও বুক মিলালেন। আর স্ববিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ সময় কোথা থেকে আসলেন? ভোর তিনটায় সেহরীর সময়ে পৌঁছেছিলাম। আমি যখন ঘটনা বর্ণনা করলাম তখন তিনি অনেক বিচলিত হলেন। কিছু সবজি ইত্যাদি তার হাতে দিলাম। যা সাথে নিয়ে এসেছিলাম। সবজি তাজা ছিল, তিনি তা নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন আর

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অবহিত করলেন। তিনি বললেন, আমার মনে আছে তখন তিনটার কাছাকাছি সময় ছিল। হযরত সাহেব (আ.) আমাকে গোল কামরায় ডেকে পাঠালেন, আর সেখানে পৌঁছার পর অনেক খাবার মওজুদ পাই। এ মুহূর্তকে আমি আমার জীবনে কখনও ভুলতে পারবো না। এটা এমন মুহূর্ত যা কখনও ভুলার নয়। কতই না ভালবাসা ও স্নেহের সাথে বার বার বলছিলেন, আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে। আমি নিবেদন করলাম না না কিছু হয়নি, হুযূর আমার কোন কষ্ট হয়নি, আর কিছু ঠাহরও করতে পারিনি। কিন্তু তিনি বার বার বলছিলেন, রাস্তা ভুলে যাওয়ার কষ্ট ভীষণ কষ্ট। আসার সময় রাস্তা ভুলে গিয়েছিলাম, পায়ে হেঁটে আসছিলাম, আর এজন্য দেরি হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, রাস্তা ভুলে যাওয়ার কষ্ট ভীষণ কষ্ট, আর খাবার খাওয়ার তাগিদ দিতে লাগলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর (আ.) সামনে খাবার খেতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। আমি ইতস্তত করছিলাম। তিনি (আ.) নিজ পবিত্র হাতে খাবার এগিয়ে দিয়ে বললেন, খাও, অবশ্যই ক্ষিদে পেয়েছে। আর সফরের ক্লান্তিও আছে। পরে আমি খেতে শুরু করি। তখন তিনি (আ.) বললেন, খুব তৃপ্তি সহকারে খাও, লজ্জা করো না, সফর করে এসেছ। হযরত হামেদ আলী সাহেবও পাশে বসা ছিলেন আর তিনি (আ.)ও সামনে ছিলেন। আমি নিবেদন করলাম, হুযূর আপনি আরাম করতে চলে যান, এখন আমি খাবার খেয়ে নিব। হযরত আকদাস (আ.) অনুভব করলেন, তাঁর সামনে আমি ইতস্তত করবো। তাই বল্লেন, ঠিক আছে, হামেদ আলী তুমি ভাল করে তাঁকে খাওয়াও। আর এখানেই তাঁর জন্য বিছানা বিছিয়ে দাও, যাতে তিনি আরাম করে নেন, আর ভালভাবে ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি চলে গেলেন কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই এক বিছানা নিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন আমার অবস্থা অদ্ভুত ছিল। এক তো আমি তাঁর (আ.) এমন ব্যবহারে নির্বাক হয়ে গেলাম। এক সম্মানিত সত্তা তাঁর নগন্য সেবকের কেমন আথিতেয়তা-ই না ব্যস্ত রয়েছেন! আমি নিবেদন করলাম, হুযূর কেন কষ্ট করছেন? বললেন, না না কষ্ট কিসের? আপনারই আজ ভীষণ কষ্ট হয়েছে, ভালভাবে আরাম করুন। এভাবে তিনি নিজ হাতে বিছানা এনে রেখে চলে গেলেন। আর হামেদ আলী সাহেব আমার পাশে বসা রইলেন। আর ভালবাসার সাথে আমাকে খাবার খাওয়ালেন। পরে হযরত হাফেয হামেদ আলী সাহেব বললেন, আপনি শুয়ে পড়েন। আমি আপনার পা টিপে দিব। তখন আমি লজ্জিত হয়ে বললাম না না আমার পা টিপার প্রয়োজন নেই। এতে হযরত হামেদ আলী সাহেব বললেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে বলেছেন, 'আপনি খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে থাকবেন, কিছুটা পা যেন টিপে দেই। তাঁর একথা শুনেই আমার চোখে এমনিতেই অশ্রু এসে গেল। হায় আল্লাহ্! কী প্রীতি ও ভালবাসায় ঐ হৃদয় পূর্ণ! নিজের সেবকদের জন্যও কতই না সহানুভূতি রাখেন! ফজরের নামাযের পর তিনি যখন পুনরায় আসলেন। তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাল ঘুম হয়েছে? এখন ক্লান্তি তো নেই? মূলত এভাবেই তিনি ভালবাসার প্রকাশ করলেন। আর তিনি বলেন, তাঁর (আ.) ঐ প্রীতি ও ভালবাসাই ঐ জিনিষ ছিল যা আমাকে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে কাদিয়ানে নিয়ে আসলো।

(সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), লেখক শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.), খন্ড ১ম পৃ-১৪৬-১৪৯)

মিয়া রহমতুল্লাহ্ বাগানুওয়ালা-এর ঘটনা। মিয়া রহমতুল্লাহ্ সাহেব বাগানুওয়ালা সেক্রেটারী আঞ্জুমানে আহমদীয়া বানগা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিষ্ঠাবান সেবকদের একজন। আর বানগা জামাআতে পরবর্তীতে খোদা তাআলা অনেক বরকত ও উন্নতি প্রদান করেছেন। ১৯০৫ সালে হযরত আকদাস (আ.) যখন বাগানে অবস্থান করছিলেন তখন মিয়া রহমতুল্লাহ্ কাদিয়ানে এসেছিলেন। আর মেহমান খানাতে মেহমান হিসেবে অবস্থান করছিলেন। মরহুম মিয়া নাজমুদ্দিন লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপক ছিলেন। তার স্বভাব-প্রকৃতিতে কোন কারণে এক ধরনের একগুয়েমী ভাব ছিল। যদিও আন্তরিকতায় তিনি কারও চেয়ে কম ছিলেন না। জামাআতের খেদমত ও মেহমানদের আরামের জন্য নিজের শক্তি ও বুঝ অনুযায়ী খেয়াল রাখতেন আর গবেষণা উন্মুখে স্বভাব ছিল তার । মিয়া রহমতুল্লাহ্ সাহেবকে কিছুটা কষ্ট পেতে হলো। কাঁচা রুটি খেতে হলো আর তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন। আমি বিষয়টি জানতে পেরে তাঁকে কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, রুটী কাঁচা ছিল, আর তন্দুরের রুটী খাওয়ার অভ্যাসও নেই। তাঁর কষ্ট আমি অনুভব করলাম। আর অস্থির হয়ে গেলাম। আমি সোজা হযরত

সাহেবের নিকট গেলাম। তিনি জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ চলে আসলেন। আর বাগানের ঐ আলোকিত অংশ যা ঘরের সামনে রয়েছে তাতে পায়চারী করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, মিয়া ইয়াকুব আলী কি হয়েছে? আমি ঘটনা বর্ণনা করে বললাম, হুযূর হয় মেহমান সবাইকে বন্টন করে দেয়া হোক, নতুবা এমন ব্যবস্থা নেয়া হোক যাতে মেহমানের কষ্ট না হয়। আমি আজ চিন্তা করি, আর এ অনুভূতিতে আমার হৃদয় নিস্তেজ হয়ে পড়ে, আমি খোদা তাআলার মামুর ও প্রেরিত সত্তার সামনে এমন ঢঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বল্লেন, আপনি খুবই ভাল করেছেন, আমাকে জানিয়েছেন। আমি এখনই ঘরে পাতলা রুটী পাকানোর নির্দেশ দিয়ে দিব। ঠিক আছে, তন্দুর রুটী খাওয়ার অভ্যাস নেই তাতে কি, নরম পাতলা রুটী পাকানোর ব্যবস্থা করে দিব। মিয়া নাজমুদ্দীনকেও বলে দিব, তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। এটা খুব ভাল কথা, যদি কোন মেহমানের কষ্ট হয় তাহলে সেটা আমাকে তাৎক্ষণিক ভাবে অবগত কর। লঙ্গরের লোক আমাকে বলে না, আর তারা বুঝেও না। আর এটাও বললেন, মিয়া রহমতুল্লাহ্ কোথায়? সে খুব বেশি অসুস্থ তো নয়? যদি সে আসতে সক্ষম হয় তাহলে তাকেও এখানে নিয়ে আস। আমি ফেরৎ এসে মিয়া রহমতুল্লাহ সাহেবকে বললাম। তিনি খুবই বিচলিত হলেন, আপনি কেন হযরত সাহেবকে (আ.) কষ্ট দিলেন? আমার স্বাস্থ্য এখন ভাল। ভাল হলো, আমি তাকে হযরত সাহেবের কাছে নিয়ে গেলাম। আর মিয়া নাজমুদ্দীন সাহেবও উপস্থিত হলেন, যিনি লঙ্গরের ইনচার্জ ছিলেন। হযরত সাহেব মিয়া রহমতুল্লাহ্ সাহেবের নিকট অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন ও ক্ষমা চাইলেন যে আমাদের বড় ভুল হয়ে গেছে, আপনার কষ্ট হওয়া উচিত ছিল না। আমি বাগানে ছিলাম। না হলে এ কষ্ট হতো না। এখন ইনশাআল্লাহ্ ব্যবস্থা হয়ে গেছে। যেভাবে হুযূর দুঃখ প্রকাশ ও খুশি করার চেষ্টা করলেন, এতে আমি ও রহমতুল্লাহ্ একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলাম। পরে যতদিন তিনি ছিলেন, হযরত সাহেব প্রতিদিন আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, কষ্ট তো নেই? আর মিয়া নাজমুদ্দীনকেও খুব নসিহত করেছেন, মেহমানদের প্রতি খেয়াল রেখ।

(সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), লেখক ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.), ১ম খন্ড, পৃ-১৪৯-১৫১)

এক অ-আহমদীর অভিভূত হওয়ার বক্তব্য শুনে নিন, যিনি ১৯০৫ সালে কাদিয়ানে এসেছিলেন। কাদিয়ান থেকে ফেরৎ যাওয়ার পর অমৃতসরের “ওকীল” পত্রিকায় নিজের সফরের কাহিনী বর্ণনা করেন। এর কিছুটা অংশ হলো, তিনি লিখছেন, আমি আর কী দেখলাম! কাদিয়ান দেখলাম। মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, মেহমান হয়ে থেকেছি। মির্যা সাহেবের আখলাক ও তাঁর মনোনিবেশের কারণে আমার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। গরমের কারণে আমার মুখে ফোস্কা পড়ে গেছে। আমি লবনাক্ত খাবার খেতে পারতাম না। মির্যা সাহেব যখনই ঘর থেকে বের হয়ে আসতেন তখনই দুধ পাউরুটীর ব্যবস্থা করতেন।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) লিখেন– হযরত সাহেব মেহমানদের আদর আপ্যায়নের খুবই ব্যবস্থা রাখতেন। যতদিন পর্যন্ত মেহমান কম ছিল, ততদিন তিনি নিজেই তাদের খাবার, বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেন। যখন মেহমান বেশি হয়ে গেল, তখন সেবক হযরত হাফেয হামেদ আলী সাহেব ও নাজমুদ্দীন প্রমুখকে তাগিদ দিতে থাকতেন-দেখ, মেহমানদের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়। তাদের অসুবিধা ও সব ধরনের প্রয়োজন-খাবার ও থাকার খেয়াল রেখ। কিছু সংখ্যককে তোমরা চিন কিছু সংখ্যককে চিন না। এজন্য ভাল হয়, সবাইকে সম্মানের পাত্র জেনে আপ্যায়ন কর। শীত কালে, চা পান করাও, কারও যেন কষ্ট না হয়। তোমাদের প্রতি আমার সুধারনা রয়েছে। তোমরা মেহমানকে আরাম দিয়ে থাক। তাদের সবার খুবই সেবা কর। যদি কারও শোবার ঘর ঠান্ডা হয়, তাহলে লাকড়ি বা কয়লা জ্বালিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর।

(যিকরে হাবীব, হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.), পৃ-১৯৫)

এক অ-আহমদীর অভিভূত হওয়ার বক্তব্য শুনে নিন, যিনি ১৯০৫ সালে কাদিয়ানে এসেছিলেন। কাদিয়ান থেকে ফেরৎ যাওয়ার পর অমৃতসরের “ওকীল” পত্রিকায় নিজের সফরের কাহিনী বর্ণনা করেন। এর কিছুটা অংশ হলো, তিনি লিখছেন, আমি আর কী দেখলাম! কাদিয়ান দেখলাম। মির্যা

সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, মেহমান হয়ে থেকেছি। মির্যা সাহেবের আখলাক ও তাঁর মনোনিবেশের কারণে আমার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। গরমের কারণে আমার মুখে ফোস্কা পড়ে গেছে। আমি লবনাক্ত খাবার খেতে পারতাম না। মির্যা সাহেব যখনই ঘর থেকে বের হয়ে আসতেন তখনই দুধ পাউরুটীর ব্যবস্থা করতেন। মির্যা সাহেবের কাদিয়ানের বাহিরে এক বড় ও উত্তম বাগান রয়েছে, যার মালিকও তিনিই, বর্তমানে তিনি তাতে অবস্থান করছেন। বুযুর্গানে মিল্লাতও সেখানেই। কাদিয়ানে প্রায় তিন হাজার মানুষের জনবসতি। কিন্তু সৌন্দর্য ও চাকচিক্য অনেক বেশি। মালীর কোটলার নওয়াব সাহেবের কুঠিই সমগ্র জনপদের একমাত্র জাঁকজমক ও শানদার অট্টালিকা। রাস্তা কাঁচা ও উঁচুনিচুঁ। বিশেষভাবে ঐ রাস্তা যা বাটালা থেকে কাদিয়ান পর্যন্ত গেছে সেটা নিজের গুণে সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। যাই হোক এরপর আবার লিখছেন, যদি মির্যা সাহেবের সাক্ষাতের বাসনা আমার হৃদয়ে উথলে না উঠতো তাহলে আট মাইল কেন আট কদমও আগে যেতে পারতাম না।

মেহমানকে এ সম্মান প্রদর্শনের গুণ এক বিশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না। ছোট বড় সবাই ভাইয়ের মত ব্যবহার প্রদর্শন করেছে।

(সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), লেখক ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.), ১ম খন্ড, পৃ-১৪৪-১৪৫)

এই কয়েকটি ঘটনা আমি উল্লেখ করলাম। যাতে এ উদ্ধৃতিগুলোর মাধ্যমে একদিকে আমাদের কর্মীদের মাঝে মেহমানদারীর প্রতি এক বিশেষ আবেগ সৃষ্টি হয়। অপরদিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের ঐ দিকগুলোও যেন আমাদের জ্ঞাত হয়ে যায়। বরং অধিকাংশই তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের ঐ দিকগুলোকে জানে না। প্রত্যেক ভাষায় সীরাতের পুস্তকও নেই। এজন্য তাদের বিষয়গুলো জানা নেই। তাই যেভাবে আমি বলেছি, অনেকের নিজস্ব মেহমান আসবে। অনেকে খুবই নিকট আত্মীয় হয়ে থাকেন। তাদের মেহমানদারী তো মানুষ খুশি হয়েই করে। অনেকে দূর সম্পর্কের আত্মীয় বা কোন পরিচয়ে পরিচিত হয়, তারা নিজ উদ্যোগে এসে মেহমান হিসেবে অবস্থান করে। তাদের মেহমানদারীও করুন। অনুরূপভাবে জামাআতী ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মীরা বিশেষভাবে এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখবেন। থাকা খাওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ট্রান্সপোর্ট এর দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদেরকে নিয়মিত ও সবচে বেশি মেহমানদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।

এ বছর ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন এসেছে। কিছু নতুন বিষয়ও আছে। এজন্য ট্রান্সপোর্ট এর কর্মীদেরকে অতি উত্তমভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। যদিও ট্রেন ও বাস চলছে। কিন্তু জামাআতের ব্যবস্থাপনায় যে বাস তা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে চলছে। এর মাধ্যমে বিশেষভাবে ইউরোপের বাইরে থেকে আগত মেহমানদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে জলসায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু অন্যান্য মেহমানদের সাথেও শক্ত কথা বলবেন না, বরং তাদের ধীরে সুস্থে বুঝাবেন। কেননা ইউরোপ থেকে আগত ও UK-এর স্থানীয় মেহমানদের নিকট 'কার' রয়েছে। আর ট্রেনের মাধ্যমে পয়সা খরচ করেও তারা যেতে পারবে। কিন্তু গরীব দেশ থেকে আগত লোকদেরকে বাস দিয়েই পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য এ ব্যাপারে নিয়োজিত কর্মীগণ এ বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখবেন। আর এখানকার যারা মেহমান রয়েছেন তাদেরকেও আমি বলছি আপনারাও এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখুন। বাহির থেকে আগতদেরকে অগ্রাধিকার দিন। আবহাওয়ার প্রতিও খেয়াল রাখুন। কেননা যে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে তাতে এর প্রতি নির্ভর করা যাবে না। এজন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ যেন এটাকে ভাল রাখেন, সব দিক থেকে আবহাওয়া উপযোগী হয়। কিন্তু কোন কারণে যদি বিরূপ কোন অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহলে কর্মীদেরকে সর্বদা সাহসী ও প্রফুল্ল মনোভাব দেখাতে হবে। গত বছরও করেছেন। এ বছরও সেটাকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। বরং পূর্বের চেয়েও বেশি রাখবেন। মূলতঃ সেবার জন্য কুরবানী করতে হয়। এজন্য সর্বদা এটা চিন্তায় রাখবেন, সেবা আমাদেরকে কুরবানী করেই করতে হবে। আরাম করে সেবা করা যায় না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মেহমানদেরকে বিশেষ ভাবে এমন সেবা করতে হবে, যাতে এর হক আদায় হয়। কেননা তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মেহমান, জলসায় আগত মেহমান। এটা করলে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হবেন।

আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সবাইকে নিজেদের দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবে আদায় করার তৌফিক দান করুন।

অনুবাদ ঃ **মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন**

মুরব্বী সিলসিলাহ্

ইনশাআল্লাহ্ মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের সকলে না হলেও অধিকাংশ লোক এই মুহাম্মদী মসীহ্‌র পতাকা তলে সমবেত হবে পারিপার্শ্বিক আলামত বলছে, সে সময় এখন সন্নিকট

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ـ

[সৈয়্যদেনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক ২৩ মে, ২০০৮ ইং মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডনে প্রদত্ত]

গত খুতবায় আমি জব্বার শব্দটির আলোকে খোদা তাআলার সত্তার ক্ষেত্রে ও বান্দার ক্ষেত্রে এ শব্দটির (ব্যবহার ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে) বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছিলাম যে, যখন এ শব্দটি আল্লাহ্ তাআলার জন্য ব্যবহৃত হয়, (অর্থাৎ) আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হয় সংশোধনকারী। আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে এজন্যই এই দোয়াটি শিখিয়েছেন, প্রত্যেক মুসলমান যেটিকে নামায পড়ার সময় দুই সিজদার মাঝে পড়ে থাকেন। এক হাদীসে এসেছে, ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) দুই সিজদার মাঝে দোয়া করতেন,

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَارْفَعْنِيْ

অর্থাৎ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর রহমত বর্ষণ কর, আমার কাজের মন্দ দিকগুলো সুধরে দাও, আমাকে রিয্ক দান কর এবং আমার আধ্যাত্মিক মর্যাদায় উন্নতি দান কর।

(সুনানে ইবনে মাজাহ্, কিতাবুস্ সালাত, বাব মা ইয়াকুলু বায়নাস্ সেজদাতাঈন হাদীস নং ৮৯৪)

অর্থাৎ - وَاجْبُرْنِيْ এর আলোকে আমার আধ্যাত্মিক, শারীরিক ও প্রকৃতিগত যত ধরনের কাজই রয়েছে তা সুধরে দাও এবং এর মাধ্যমে আমার সকল কাজ পরিপাটি করতে থাক। আঁ হযরত (সা.) এ দোয়া এজন্যই শিখিয়েছেন, যেন আমরা আল্লাহ্ তাআলার গুণকে মনে রেখে, খোদা তাআলার নিকট আমাদের নিজেদের সংশোধন যাচনা করি এবং ঐ অবস্থা হতে পরিত্রাণের চেষ্টা করি। যারা খোদা তাআলাকে ভুলে গেছে, এমন লোকদের জন্য যখন এ শব্দটির ঐ সকল অর্থ প্রয়োগ হয়, তখন এর ফলে মানুষ সীমালঙ্ঘনকারী, কঠোরতা অবলম্বনকারী, বিদ্রোহী ও অহংকারী বলে বিবেচিত হয়, বিশেষ করে নবীগণের বিরোধীরা এ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়।

এখন আমি 'সংশোধন'-এর আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কিছু ইলহাম ও উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো,-

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম,-

"تُوْبُوْا وَاَصْلِحُوْا وَاِلَى اللّٰهِ تَوَجَّهُوْا" -

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং এর অর্থ করেছেন, তওবা করো এবং পাপাচার, কুফরী ও অবাধ্যতা হতে নিভৃত হও আর নিজ অবস্থার সংশোধন কর এবং খোদা তাআলার দিকে মনোনিবেশ করো। (তাযকেরা, পৃষ্ঠা ৬৩, ৪র্থ সংস্করণ রাবওয়া থেকে প্রকাশিত)

এই ইলহামটি ১৮৮৩ সালের, অর্থাৎ প্রথম বয়আত নেয়ার প্রায় ছয় বৎসর পূর্বের, এর মাধ্যমে যুগের অবস্থার দৃশ্যপট বর্ণিত হচ্ছে যে, নিজেদের সংশোধনের জন্য খোদা তাআলার দিকে মনোনিবেশ করো। ঐ যুগে যাঁরা ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তাঁরাও এ বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন যে, ইসলামের কী অবস্থা হচ্ছে! তখন আল্লাহ্ তাআলা যাঁকে যুগের সংশোধনের জন্য প্রেরণ করেছেন, সেই জারী উল্লাহ্ (আল্লাহ্ তাআলার বীর,) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এ পয়গাম পাঠিয়েছেন যে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ করো। খোদা তাআলার রহমত উদ্বেলিত হয়েছে, যে সংশোধনকারী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, অচিরেই তিনি আগমন করবেন, তাঁর আগমনের পর তাঁকে অস্বীকার করো না। বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা, ভূমিকম্প ও ঐশী বিপদাবলীর বিষয়ে শুধু চিন্তা করে কোন লাভ হবে না, যদি না আমলগত অবস্থার পরিবর্তন করে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে এ সংবাদও দিয়েছিলেন যে,

"اَلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا اُوْلٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ" -

"যে সব লোক তওবা করবে এবং নিজেদের অবস্থা সুধরে নিবে, আমিও তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করবো। আমি সবচাইতে বেশি ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী। (তাযকেরা পৃষ্ঠা ১৫০-১৮০)

সুতরাং আহমদীয়াতের বিরোধীদের জন্য এটাও বড় চিন্তার বিষয় যে, এটা খোদা তাআলার অঙ্গীকার, আর খোদা তাআলার সাথে কেউ লড়াই করতে পারে না। জামাআতে আহমদীয়ার ইতিহাস ও জামাআতের উন্নতি এখন ঐ বিরুদ্ধবাদীদের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তাআলা তাদের চোখ খুলে দিন আর উম্মতে মুহাম্মদীয়ার প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ বিরোধিতা ভুলে গিয়ে, এই মসীহ্ ও মাহদীর হাতকে দৃঢ় করার তৌফিক দান করুন, যাতে তারা আল্লাহ্ তালার মাগফিরাত (ক্ষমা) ও রহমতের চাদরে নিজেদেরকে জড়িয়ে নিয়ে, দুনিয়া ও আখেরাতকে পরিপাটিকারী বলে বিবেচিত হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উম্মতে মুহাম্মদীয়ার অবস্থা সম্পর্কে এতো চিন্তা করতেন যে, সর্বদা এ কাজেই লেগে থাকতেন। আঁ হযরত (সা.)-এর সম্মান, ইজ্জত ও পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর (আ.) জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, এ কারণেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এই দোয়াটি ইলহামের মাধ্যমে শিখিয়েছেন–

رَبِّ اَصْلِحْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ --

"হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সংশোধন করে দিন।' (তাযকেরা পৃষ্ঠা-৩৭)

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর (আ.) সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন, তাঁকে যে দোয়াটি শিখিয়েছেন, সেটা এজন্য শিখিয়েছেন যেন তা গৃহীত হয় এবং **ইনশাআল্লাহ্ এ বিষয়ে আমরা নিরাশ নই যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সকলে অথবা অধিকাংশ লোক, অবশ্যই এই মসীহে মুহাম্মদীর পতাকা তলে একত্রিত হবে। আলামত (পারিপার্শ্বিক অবস্থা) সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সে সময় এখন সন্নিকট আর আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এমনটি অচিরেই সম্পন্ন হবে ইনশাআল্লাহ্।** কিন্তু সেই সকল উলামা ও নেতা, যারা সাধারণ লোকদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে, তাদের এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করা উচিত যে, যদি তারা নিজেদের সংশোধন না করে, তবে আল্লাহ্ তাআলার অপ্রতিরোধ্য ভয়াল থাবার শিকার হতে পারে। একদিকে তো তারা নিজেরাই বলে, তারা যুগ মসীহ্র আগমনের আশায় অপেক্ষমান বরং অস্থির। কিন্তু যিনি দাবী করেছেন তাঁকে তো শুধু তারা নিজেরাই মান্য করা হতে বিরত হচ্ছে না বরং অন্যদেরকেও ভুল পথে পরিচালিত করছে এবং ভয় দেখাচ্ছে।

পাকিস্তানের একজন বড় আলেম, যিনি জামাআতের বিরোধিতার ব্যাপারেও অগ্রগামী, তার নাম ড. ইসরার আহমদ, তিনি এক স্থানে লিখেন, "প্রকৃত ও সুদৃঢ় ইতিহাসের ভিত্তি গত চারশত বছরের ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, গত চার শতাব্দীতে ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের সমস্ত কাজ পাক ভারত উপমহাদেশে সম্পন্ন হয়েছে এবং এই সময়কালে সকল মহান মুহাদ্দেসগণ এ ভূখন্ডে জন্মেছেন, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঐশী ইচ্ছা

ও প্রজ্ঞায় সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত বিস্তৃত কোন পরিকল্পনা এ ভূখন্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে" [পাকিস্তান কা মুস্তাকবেল, নাওয়ায়ে ওয়াক্ত প্রকাশনী ১৬-০৭-১৯৯৩]

তিনি তো সরাসরি বলেননি কিন্তু এ বর্ণনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, তার মতেও খাতামুল খুলাফা ও মসীহ্ মাওউদ এর আগমনের নযির এ ভূ-খন্ডে দেখা যাচ্ছে। এসব লোক দেখে না যে, আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা অনুযায়ী যখন একজন দাবীকারক দাবী করেছেন এবং তাঁর পক্ষে আসমানী ও জমিনী নিদর্শনসমূহ প্রদর্শিত হচ্ছে, তখন অন্ধের মতো কেন তাঁর বিরোধিতায় লেগে রয়েছি। আসলে দুনিয়ার মোহ তাদের চোখে পর্দা ফেলে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা এমন লোক, যারা পড়াশোনা করে বৃথা সময় নষ্ট করেছে, বাহ্যত জ্ঞানী কিন্তু ঐশী ইশারা বুঝতে পারে না বরং দেখার পরও অস্বীকার করে। তারা তাদের চোখের পর্দা উঠাতে চায় না। এসব লোক তাদের নিজেদেরকে...... বধির, বোবা ও অন্ধ (বাকারা-১৯) আয়াতের সত্যায়নকারী বানিয়ে রেখেছে। তারা বধির, বোবা ও অন্ধ। আল্লাহ্ তাদের বাহ্যিক ভাবে জ্ঞানের আলো দান করেছেন কিন্তু তাদের এই জ্ঞান তাদেরকে আলোকবর্তিকা বানানোর পরিবর্তে মসীহ্ মাওউদ-(আ.)-এর বিরোধিতার কারণে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত করে দিয়েছে। যেভাবে এ যুগের কতক উলামাদের সম্পর্কে হাদীসও রয়েছে। যদি সত্যই তাদের হৃদয় কলুষ মুক্ত হয়ে থাকে আর সত্য সত্যই যদি তাদের হৃদয়ে উম্মতে মুসলেমাহ্ (মুসলমান) এর জন্য সহানুভূতি থেকে থাকে তবে তাদের উচিত, তারা যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তাআলার নিকট নিজেদের সংশোধনের জন্য ও সঠিক দিকনির্দেশের জন্য দোয়া করে, নচেৎ তারা নিজেরাও বিপথগামী হবে এবং তাদের অনুসারিদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। কোন মসীহ্, না তাদের সংশোধননের জন্য আসবে আর না তাদেরকে এ অস্থিরতা থেকে মুক্তি দিবে। আল্লাহ্ এ জাতিসমূহকে সংশোধন করুন, যাতে তারা সত্য মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে।

যেভাবে আমি বলেছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তাআলার সাহয্য - সহযোগিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। খোদা তাআলা তাঁকে পূর্বেই এটা জানিয়েছেন এবং বিজয় ও সফলতার সুসংবাদ দিয়েছেন আর অসংখ্য বার দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর (১৮৯৩ সালের একটি স্বপ্ন ও ইলহাম-এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,–

"আমি স্বপ্নে দেখেছি, এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, আমার নাম ফাতাহ (বিজয়) ও যাফর (সফলতা), এরপর মুখে এ বাক্যটি জারি হয়ে গেল,

أَصْلَحَ اللّٰهُ أَمْرِيْ كُلَّهُ۔"

অর্থাৎ খোদা তাআলা আমার সকল কাজ সুধরে দাও।" (তাযকেরা, ২০২ পৃঃ)

তাঁর এ দাবী যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে বিজয় ও সফলতার সুসংবাদ শুনিয়েছেন আর তাঁর মৃত্যুর একশত বছর পরও তাঁর জামাআতের সাথে আল্লাহ্ তাআলার এমন ব্যবহার যে, শুধু উন্নতির দিকেই ধাবিত হচ্ছে, এটা কি এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ নয়, এটা দলিল হিসেবে যথেষ্ট নয় যে, তিনি-ই আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যাদিষ্ট এ যুগের মহাপুরুষ। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ার লোকদের চোখ খুলে দিন, তারা যেন কোন ধ্বংসকে আহবান করার পরিবর্তে অনতিবিলম্বে সত্য গ্রহণকারী ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম

أَصْلِحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ إِخْوَتِيْ

তিনি (আ.) বলেন, এ ইলহাম এর অর্থ, হে আমার খোদা! আমার ও আমার ভাইদের মাঝে সংশোধন করে দাও। প্রকৃতপক্ষে এ ইলহামটি ঐ সকল ইলহামের পূর্ণতা বলে মনে হয় যেগুলোতে খোদা তাআলা ঐ বিরোধিতার পরিণাম বলে দিয়েছেন। সেই ইলহামগুলো হচ্ছে

خَرُّوْا عَلَى الْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِيْنَ۔

تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ۔

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔

তিনি (আ.) নিজে লিখেন যে, "অর্থাৎ কতক চরম বিরোধীর এ পরিণাম হবে যে, তারা কিছু নিদর্শন দেখে খোদা তাআলার সামনে সিজদাবনত হয়ে বলবে, হে আমাদের খোদা! আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর, আমরা ভ্রান্তিতে নিপতিত এবং আমাকে সম্বোধন করে বলবে [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলছেন, আমাকে সম্বোধন করে বলবে] যে, খোদার কসম! খোদা আপনাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান

করেছেন এবং আপনাকে মনোনীত করেছেন আর আমরা ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিলাম, তাই আপনার বিরোধিতা করেছি। এর উত্তর হবে, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। খোদা তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন কেননা তিনি সবচেয়ে বেশী দয়াবান। এমনটি তখন হবে, যখন বড় বড় নিদর্শন প্রদর্শিত হবে, কোন সত্য মসীহ্ কি এর চেয়ে বেশী নিদর্শন দেখাতে পারবে অথবা তার জন্য কি এর চেয়ে বেশী ঐশী সাহায্য ও সহযোগিতা হতে পারত? তখন একবার তাদের মাঝে গায়েব (অদৃশ্য) হতে শক্তি সঞ্চিত হবে এবং তারা সত্যকে গ্রহণ করে নিবে। [তাযকেরা পৃষ্ঠা ৬০৫]

আমরা তো এটাই দোয়া করি যে, খোদা কাউকে ভয়াবহ নিদর্শন দেখানোর পূর্বেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে চেনার জ্ঞান দান করুন, তাঁকে মানার তৌফিক দান করুন এবং তারা সত্যকে গ্রহণকারী বলে বিবেচিত হোক।

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে বলেছেন,

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ

(সূরা ইব্রাহীম-১৫)

তারা আল্লাহ্ তাআলার কাছে বিজয় প্রার্থনা করেছে আর কট্টর শত্রু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়টি সহজ ও সুস্পষ্টভাবে বলতে গিয়ে বলেছেন,–"এটা আল্লাহ্ তাআলার সুন্নত (নীতি) যে, আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণকে কষ্ট দেয়া হয়। তাঁদেরকে বিপদের পর বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এটা এজন্য নয় যে, তাঁরা ধ্বংস প্রাপ্ত হবেন বরং ঐশী সাহায্য-সহযোগিতাকে আকৃষ্ট করে, আর এ কারণেই তাঁর (সা.)-এর মক্কার জীবন, মদীনার জীবন অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ছিল।" অর্থাৎ বেশী দিন ব্যাপী ছিল। "মক্কায় তের বছর ও মদীনায় দশ বছর অতিবাহিত করেন, যেমনটি এ আয়াত থেকে পাওয়া যায়, প্রত্যেক নবী ও আল্লাহ্ প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণের সাথে তেমনটি-ই ঘটেছে; প্রথম পর্যায়ে দু:খ দেয়া হয়েছে, ধোকাবাজ, দাগাবাজ, দোকানদার আরো কত কিছু-ই না বলা হয়েছে।" এ ধরনের কথা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কেও বলা হয়েছে এবং বলা হয়। এমন কোন মন্দ নাম নেই যা তাঁদের জন্য রাখা হয় না। সেই নবী ও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ প্রত্যেক বিষয়ে এবং প্রত্যেক কষ্টে ধৈর্য ধারণ করেন। কিন্তু যখম সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে অন্য এক শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এভাবেই রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে সকল ধরনের দু:খ-কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং তাঁর (সা.) জন্য সব ধরনের মন্দ নাম রাখা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর (সা.) মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে এবং ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, যেমনটি এই শব্দে পাওয়া যায় এবং এর ফলাফল হচ্ছে

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ

(সূরা ইব্রাহীম-১৫)

সকল কুচক্রী ও শয়তানী পরিকল্পনাকারীরা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। বিরোধিতার চরম পর্যায়ে এমন মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, কেননা যদি প্রথমেই এমন হতো তবে সব ধ্বংস হয়ে যেত। মক্কা জীবন ওয়াহেদ (এক অদ্বিতীয়) খোদা তাআলার দরবারে অবনত হওয়ার ও কান্না-কাটির যুগ ছিল, এ অবস্থা এতদূর গড়িয়েছিল যে, দর্শক – শ্রোতাদের গা শিউড়ে উঠে। কিন্তু মদীনার জীবনের প্রতাপকে দেখ, যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং হত্যা ও বহিষ্কারের পরিকল্পনায় ব্যস্ত থাকত, তারা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে আর বাকীদেরকে তাঁর সামনে অনুনয় - বিনয়ের সাথে নিজেদের ভুল-ত্রুটি ও দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪২৪ নতুন সংস্করণ রাবওয়া থেকে প্রকাশিত)

আল্লাহ্ তাআলা উম্মতে মুসলেমাহ্-র উপরও দয়া পরবশ হোন, যাদের অধিকাংশ নিজেদের ইতিহাস ও নিজেদের ঘটনাসমূহ অবলোকন করে অত্যাচারিত হওয়ার পরিবর্তে অত্যাচারী হয়ে অত্যাচার করায় অগ্রবর্তী হচ্ছে আর তারা যুগ ইমামকেও চিনে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ উদাহরণ দেয়ার কারণ, এ যুগেও একই অবস্থা হচ্ছে। মুসলমান মসীহ্ ও মাহদীকে মানছে না। অমুসলিমরা আঁ হযরত (সা.)-এর ব্যাপারে যেমনটি করছে, সে সব বিষয়ের যদি সংশোধন না হয় তবে এগুলো সকল ধর্ম ও জাতিকেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

বলেন,–"খোদা তাআলা জানেন, নেহায়েত কল্যাণকামী হিসেবে বলছি। এখন আমার কথা কেউ সুধারণা নিয়ে শুনুক অথবা কু-ধারণা নিয়ে, আমি বলবোই, যে ব্যক্তি সংশোধনকারী হতে চায়, তার উচিত প্রথমে সে নিজে যেন আলোকিত হয় এবং নিজের সংশোধন করে....।" যারা আজ-কাল সংশোধনকারী সেজে বসে আছেন তাদেরকে এ বিষয়টি মনে রাখা উচিত।

"........দেখো, এই আলোক-উজ্জ্বল সূর্য প্রথমে নিজে আলোকিত হয়েছে। আমি অবশ্যই মনে করি যে, প্রত্যেক জাতির মুয়াল্লেম (নবী) এ শিক্ষাই দিয়েছেন কিন্তু এখন অন্যের মাথায় লাঠি মারা খুব সহজ আর নিজের ত্যাগ স্বীকার বড় কষ্টকর হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি জাতির সংশোধনকারী ও কল্যাণকামী হতে চায়, তার উচিত সে যেন তার নিজের সংশোধন দিয়ে শুরু করে। প্রাচীন যুগে ঋষি ও অবতারগণ বনে-জঙ্গলে গিয়ে, কিভাবে নিজেদের সংশোধন করতেন? তাঁরা আজকালের বক্তাদের মত মুখ খুলতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে আমল না করতেন। এটাই খোদা তাআলার নৈকট্য ও ভালবাসার পথ। যে ব্যক্তি নিজ হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতার কিছুই ধারণ করে না তার নসিহতমূলক বক্তৃতা পয়ঃনালার পানির মত যা ঝগড়া সৃষ্টি করে অপরদিকে আধ্যাত্মিকতার নূর ও আমলে যা পরিপূর্ণ হয়ে থাকে তা ওই বৃষ্টির মত, যাকে রহমত মনে করা হয়।...।"

তিনি (আ.) বলেন...... আমার নসিহত মত আমল কর, যে ব্যক্তি নিজেই বিষ পান করছে সে অন্যের বিষের কী চিকিৎসা করবে, যদি চিকিৎসা করে তবে সে নিজেও মরবে আর অন্যকেও মারবে, কেননা তার মাঝে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। তার বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে তার চিকিৎসা লাভজনক হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিকর হবে। মোট কথা মতপার্থক্য যতটা বৃদ্ধি পায়, তা কেবল ঐ সকল লোকদের জন্য যারা শুধু কথা বলা শিখেছে। (মলফুযাত, চতুর্থ খন্ড, পৃঃ ১৬২-১৬৩)

তিনি (আ.) আরো বলেন, আমার মতে পবিত্র হওয়ার একটা উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, মানুষ যেন কোন ধরনের অহংকার ও দাম্ভিক্য না দেখায়, না জ্ঞানের, না বংশের আর না অর্থের, এর চাইতে উত্তম পদ্ধতি পাওয়া সম্ভব নয়। যখন খোদা তাআলা কাউকে দৃষ্টি শক্তি দান করেন, তখন সে সকল প্রকার আলো দেখে, যা সকল অন্ধকার হতে মুক্তি দিতে পারে, তা আকাশ থেকেই আসে আর মানুষ সর্বদা আসমানী আলোর-ই মুখাপেক্ষী। যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশ হতে সূর্যের আলো না আসে, ততক্ষণ চোখও দেখতে পায় না। এভাবেই বাতেনী (আধ্যাত্মিক) আলো, যা প্রত্যেক ধরনের অন্ধকার দূর করে থাকে এবং এর বিপরীতে তাক্ওয়া ও তাহারাত (পবিত্রতা)-এর নূর সৃষ্টি করে, তাও আকাশ থেকেই আসে। আমি সত্য সত্য বলছি, মানুষের তাক্ওয়া, ঈমান, ইবাদত ও পবিত্রতা, এ সব কিছু আকাশ থেকেই আসে আর এটা খোদা তাআলার আশীস ও দয়ার উপর নির্ভর করে। তিনি যদি চান তবে এটাকে প্রতিষ্ঠিতও রাখতে পারেন আর যদি চান তবে দূরীভূতও করে দিতে পারেন।

"সুতরাং এরই নাম সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞান (মা'রেফত) যে, মানুষ নিজেকে তুচ্ছ ও উল্লেখ করার অযোগ্য মনে করে (অর্থাৎ কোন কিছুই মনে করে না)। খোদা তাআলার দরবারে নম্রতা ও বিনয়ের সাথে অবনত হয়ে খোদা তাআলার আশীস ও দয়া প্রার্থনা কর এবং মা'রেফাতের (তত্ত্বজ্ঞানের) নূর প্রার্থনা কর, যা প্রবৃত্তির তাড়নাকে জ্বালিয়ে দেয় এবং (মানব সত্তার) মাঝে এক নূর, নেকী করার শক্তি ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। অতঃপর যদি তাঁর ফযল থেকে কখনো কোন অংশ পাওয়া যায়, হৃদয়ে কোন ধরনের প্রশস্ততা অর্জিত হয়, (হৃদয়ের প্রশান্তি পাওয়া যায়) তবে এর জন্য অহমিকা ও গর্ববোধ করো না বরং বিনয় ও নম্রতা যেন আরো বৃদ্ধি পায়। কেননা সে নিজেকে যতটা তুচ্ছ সত্তা মনে করবে, খোদা তাআলার পক্ষ থেকে তার জন্য ততটাই আনন্দ ও নূর অবতীর্ণ হবে, যা তাকে আলো দান করবে ও শক্তি যোগাবে। যদি মানুষ এর উপর বিশ্বাস রাখে, আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলার ফযলে অবশ্যই তার চারিত্রিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে । দুনিয়াতে নিজেকে কোন একটা কিছু মনে করাও অহংকার এবং এমন অবস্থা-ই সৃষ্টি করে, অতঃপর মানুষের এমন অবস্থা হয় যে, সে অন্যকে অভিসম্পাত করে এবং তুচ্ছ জ্ঞান করে"। (মলফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২১৩)

আজকাল আলেমদের এমনই অবস্থা। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে যে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, নিজের সংশোধনের জন্য সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করা প্রয়োজন আর বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে নিজের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু যদি নিজের বাহু বলের উপরই ভরসা থাকে আর নিজের জ্ঞানকেই সব কিছু মনে করা হয় তবে এমন লোক নিজেকে অহংকারী ও উদ্ধত তো বলতে পারে, কিন্তু সংশোধিত ও আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী হতে কল্যাণ প্রাপ্ত বলতে পারে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে আরো বলেন,

সংশোধনের পন্থা হিসেবে সর্বদা সেটিই উপকারী ও ফলদায়ক হয়েছে, যেটি আল্লাহ্ তাআলার অনুমতি ও ইশারায় হয়েছে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তির ধারণাপ্রসূত প্রস্তাব ও পরিকল্পনার মাধ্যমে বিশৃঙ্খল জাতিসমূহের সংশোধন হয়ে যেত, তবে দুনিয়াতে নবী রসূলগণের (আ.) কোন প্রয়োজন ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত রোগ নির্ণয় পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন না হয় এবং পূর্ণ আস্থার সাথে এর চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জানা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত চিকিৎসায় সাফল্য আসতে পারে না। ইসলামের অবস্থা যে দুর্বল হচ্ছে সেটা এই ধরনের চিকিৎসকদের কারণেই হচ্ছে; যারা এর রোগ নিরোপন করেনি এবং যে চিকিৎসা তাদের মনে এসেছে, নিজেদের স্বার্থকে সামনে রেখে সে চিকিৎসাই শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু অবশ্যই স্মরণ রেখো, এ রোগ ও চিকিৎসা হতে এসব লোক পুরোপুরি অজ্ঞ। একে তিনিই চিনে থাকেন খোদা তাআলা যাকে শুধু এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন আর আমি-ই সেই ব্যক্তি।" (মলফুযাত, ৮ম খন্ড, পৃঃ ১৩৩-১৩৪)

এরপর তিনি (আ.) আরো বলেন, "খুব স্মরণ রেখো, আত্মার সংশোধন তাঁরই কাজ, যিঁনি আত্মা সৃষ্টি করেছেন।" আত্মা যিঁনি সৃষ্টি করেছেন, আত্মশুদ্ধিও তাঁরই কাজ। "শুষ্ক বাক্যব্যয় ও ভাষার তীক্ষ্নতা সংশোধন করতে পারে না বরং ঐ সকল কথার মাঝে এক রূহ (আধ্যাত্মিক শক্তি) থাকা উচিত। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়ে তথাপি এতটুকুও বুঝে না যে, হেদায়াত আকাশ থেকে আসে, তবে সে কি বুঝেছে? اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ যখন (অর্থাৎ তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?) এ প্রশ্ন করা হবে তখন বুঝবে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, তিনি (আ.) ফার্সি একটি পংতি লিখেছেন–

"خدارا بخدا تواں شناخت"।

অর্থাৎ খোদার মাধ্যমেই খোদাকে চেনা যায়। তিনি (আ.) আরো বলেন,–আর এ মাধ্যম, ইমাম ব্যতীত পাওয়া যেতে পারে না, কেননা তিনি খোদা তাআলার জলজ্যান্ত নিদর্শনের প্রকাশস্থল এবং তাঁর তাজাল্লী প্রকাশের ঠিকানা। এজন্যই হাদীস শরীফে এসেছে

مَنْ لَّمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهٖ فَقَدْ مَاتَ مِيْتَةً الْجَاهِلِيَّةِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যুগের ইমামকে চিনতে পারেনি, সে অজ্ঞতার মৃত্যু বরণ করেছে।

(আল হাকাম ৯ম খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা, ২৪মে ১৯০৫ইং)

আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ার লোকদেরকেও এই ইমামকে মানার তৌফিক দিন, যাতে এ লোকেরা আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি হতে বাঁচতে পারে। অনেক অ-আহমদী খুতবা শুনে থাকেন, এরপর চিঠিও লিখে থাকেন, কিছু লোক প্রভাবিতও হন কিন্তু ভয়ের কারণে (আহমদীয়াত) গ্রহণ করতে পারেন না। কিছু লোক এমনও রয়েছেন যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা, আমাদের M.T.A-এর অনুষ্ঠান দেখার মাধ্যমে (আহমদীয়াত) গ্রহণের সুযোগ দিচ্ছেন, তাঁর কল্যাণ বর্ষণ করছেন। তাই তাদের এখন দুনিয়াকে ভয় করার পরিবর্তে, বর্তমান যুগের আহ্বানকে শোনা উচিত, হযরত মসীহ্ ও মাহ্দী-এর মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছা আল্লাহ্ তাআলার আহ্বানকে শোনা উচিত। আমরা যারা এ যুগের ইমামকে মানার দাবি করছি, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নিজেদেরকেও সত্যিকার সংশোধনের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করার তৌফিক দান করুন। আমরা যেন খোদা তাআলার দরবারে সবিনয়ে অবনত হই ও আল্লাহ্ তাআলার এ নূর থেকে কল্যাণ লাভকারী হই, যা আমাদের হৃদয় সমুহকে সর্বদা আলোকিত রাখবে।

অনুবাদঃ **মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম**

মুরব্বী সিলসিলাহ্

কুরআন আমার প্রিয় কুরআন

আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

(৩য় কিস্তি)

"কুরানের আলো সব আলো থেকে উজ্জ্বল প্রকাশিল

পবিত্র সেই যা থেকে নদীর এই আলো প্রকাশিল"॥

(বারাহীনে আহমদীয়া)

কুরআন অনুধাবনের পদ্ধতি

কুরআন করীম আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তাআলার পবিত্র বাণী। এ বাণী বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে হলে আল্লাহ্প্রদত্ত বিধান মেনে চলতে হবে। আমরা কোন বস্তু তখনই দেখতে পাই যখন সেই বস্তুর আলো এসে আমাদের চোখে পড়ে। আর আমাদের চোখের আলোর সাথে সুসামঞ্জস্য ঘটায়। দ্রষ্টার চোখ এবং দৃশ্যমান বস্তুর মাঝে এর কোন ব্যত্যয় ঘটলে দর্শন ক্রিয়া সাধিত হয় না। কুরআন বুঝার বেলায়ও এমনই প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম **ক্বাদ আফলাহা মান তাযাক্কা** অর্থাৎ সে অবশ্যই সাফল্য লাভ করেছে যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে (৮৭ ঃ ১৫) প্রক্রিয়ায় নূর বা আলোতে পরিণত হয়েছিলেন। তাই জিব্‌রাঈল আমীন যখন কুরআনের আলো তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন তখন তিনি তা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। মোটকথা ওহী ইলহামের আলোকেই কুরআন উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু এর বিপরীতে **ওয়া ক্বাদ খাবা মান দাস্‌সাহা** অর্থাৎ যে একে (অর্থাৎ আত্মাকে মাটিতে) প্রোথিত করেছে সে বিফল হয়েছে (৯১ ঃ ১১)। অতএব একই পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বসবাস করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পবিত্র কালাম উপলব্ধি করে এর জ্যোতিতে জ্যোতির্মন্ডিত হয়েছিলেন অথচ আবু জাহল একে উপলব্ধি না করার দরুন কালিমা লিপ্ত হয়েছিল এবং অন্ধকারের বাসিন্দায় পরিণত হয়েছিল।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)ও এ পদ্ধতিতে কুরআন করীম বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং একটা সময় পর্যন্ত তাবা তাবেঈনরাও তাঁদের সাহচর্যে এসে উপকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে প্রায় এক হাজার বছর কাটে ঘোর আমানিশার অন্ধকারে। এ সময় কুরআনকে সেভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা হয়নি। কেবল আল্লাহ্‌র কালাম হিসেবে পুঁথি পাঠের ন্যায় পাঠ করার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। অবশেষে এমন এক সময়ও এলো যখন কুরআন স্থান পেলো গিলাফকৃত অবস্থায় তাকের ওপর।

কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল গোটা বিশ্বের সারা জাতি গোষ্ঠীর মানুষকে পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। একথা আমরা আগেও বলে এসেছি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট জাতি গোষ্ঠীর ভাষায় অনুবাদ করে না দিলে সে উদ্দেশ্য সাধন ছিল দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু কুরআন অনুবাদ করাকে কোন এক সময় পাপকর্ম বলে মনে করা হতো। এ কুরআনও বেদের ন্যায় একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর করতলগত বা বলা চলে কুক্ষিগত হয়ে গেল। তারা এ নিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য শুরু করে দিল। ব্রাহ্মণ ছাড়া বেদ যেমন অন্যদের পাঠ করার অধিকার ছিল না তেমনি একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী ছাড়া অন্যদের কুরআন বুঝার ও উপলব্ধি করার সুযোগ যেন আর থাকলো না। একথা না বললে সত্যের অপলাপ হবে যে কোন এক সময় এ কুরআন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন একজন হিন্দু ভাই গিরীশ চন্দ্র সেন।

এ ঘোর অমানিশার অন্ধকার রজনীর পর আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চতুর্দশীর চাঁদরূপে আবির্ভূত হলেন যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "আমি কুরআন শরীফের হকীকত ও মা'রেফত (গভীর তত্ত্বজ্ঞান) প্রকাশ করিবার নিদর্শন প্রদত্ত হইয়াছি এমন কেহ নাই যে এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে" (জরুরতুল ইমাম, পৃষ্ঠা ১২৭, বাংলা সংস্করণ)।

তিনি (আ.) আরও বলেন ঃ

"প্রায় ২০ বছর পূর্বে, বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে এই ইলহামটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে–**আর রহমান 'আল্লামাল কুরআন–লিতুনযিরা ক্বাওমাম্মা উনযিরা আবাউহুম ওয়া লি তাসতাবীনা সাবীলাল মুজরিমীন। কুল ইন্নী উমিরতু ওয়া আনা আওওয়ালুল মু'মিনীন** অর্থাৎ অযাচিত-অসীম দানকারী যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন যেন তুমি সেই জাতিকে সতর্ক কর যাহাদের পিতৃপুরুষকে (ইতিপূর্বে) সতর্ক করা হয় নাই, যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হইয়া যায়। তুমি বল, 'আমি আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমি মু'মিনদের মধ্যে প্রথম।'

এই ইলহাম অনুযায়ী খোদা আমাকে

কুরআনের জ্ঞান দান করিয়াছেন। তিনি আমাকে সমুদ্রের ন্যায় মা'রেফত এবং তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। এবং বার বার ইলহাম যোগে জানাইয়াছেন, বর্তমান যুগে ঐশী জ্ঞানে আমার সমকক্ষ আর কেহ নাই। আমি খোদার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি মল্ল যুদ্ধের ময়দানে দন্ডায়মান। যে আমাকে গ্রহণ না করিবে অবিলম্বে মৃত্যুর পর সে লজ্জিত হইবে। আর এখন সে আল্লাহ্‌র অকাট্য যুক্তির নিচে দন্ডায়মান" (জরুতুল ইমাম, পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৪, বাংলা সংস্করণ)

প্রসঙ্গত বলা যায়, মহান ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর (আ.) প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের খলীফাগণের প্রচেষ্টায় আজ প্রায় ১০০টি ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রায় ৬৮ টি ভাষায় এর মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে। এখন জামাআতে আহমদীয়া দাবী করতে পারে কিছুটা হলেও বিশ্বের জাতি গোষ্ঠীর কাছে কুরআনের বাণী পৌঁছে দিয়ে কুরআনের তবলীগ পৌঁছানো হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্‌।

তাই যে কথা আলোচনা করেছিলাম সে কথায় আসা যাক। কুরআন বুঝতে হলে কুরআন উপলব্ধি করতে হবে। প্রয়োজন ঐশীজ্ঞান তথা ওহী ইলহামের। এর সৌভাগ্য যাদের লাভ হয় তারাই কেবল নিজেরা এ মহান কালাম বুঝতে পারেন এবং অন্যদেরও বুঝাতে পারেন। একথা কেবল জামাআতে আহমদীয়াই বিশ্বাস করে না অন্যদের কারও কারও মুখেও একথা শুনেছি।

আশির দশকের কথা। খাকসার তখন পটুয়াখালীতে একটি ছোট খাট ব্যবসা করি এবং পটুয়াখালী জামাআতকে নুতন করে প্রতিষ্ঠা করে এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করছি। খাকসারের তবলীগে আবহাওয়া অফিসের স্থানীয় কর্মকর্তা জনাব গিয়াসউদ্দীন আহমদ সাহেব সপরিবারে আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। কোন একদিন মাওলানা দেলওয়ার হোসেন সাঈদী সাহেব পটুয়াখালী এলেন। পটুয়াখালী জুবিলী স্কুলে তার বিশাল মাহফিলের প্যান্ডেল তৈরী করা হয়েছে। পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি লোক সমাগম হয়েছে। আমি গিয়াস সাহেবকে নিয়ে গেলাম মাহফিল শুনতে। সাঈদী সাহেব তার বক্তৃতার কোন এক পর্যায় বলে ফেললেন, কুরআন বুঝতে হলে ওহীর জ্ঞানের আবশ্যক। সাথে সাথে গিয়াস সাহেবকে বললাম, শুনলেন তো! একথা আহমদীরা বললে দোষ। আর হযরত মির্যা সাহেব তো ওহী ইলহামের দাবী করেই কাফের হয়ে গেছেন। সে যা-ই হোক সত্য কথা অবলীলায় মুখ থেকে বের হয়ে যায়। এর কাছা কাছি সময়ের আর একটি ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখ না করে পারলাম না। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সাহেব ঢাকা সিটির জামাতে ইসলামীর আমীর তখন। তিনি গেছেন পটুয়াখালীতে সভা করতে। টাউন হলে সভার আয়োজন করা হয়েছে। জনাব নাসির উদ্দিন মিল্লাত তখন আমার জামাআতের খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য। তাকে দিয়ে নিজামী সাহেবকে ইমাম মাহদী সম্পর্কে তার কি ধারণা এ প্রশ্নটি করলাম। মাওলানা সাহেব জবাব দিলেন, যার মাধ্যমে খিলাফত কায়েম হবে তিনিই ইমাম মাহদী। ২০/২৫ বছর আগের কথা। মেঘনা পদ্মায় অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। আহমদী জামাআত হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের শতবার্ষিকী উৎসব পালন করছে এ বছর। তিনি যা বলেছেন তার গুরুর পুস্তকাদিতে এভাবেই লেখা আছে। তিনি এখন জীবনের শেষ বেলায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাকে সে দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিনীতভাবে বলতে চাই, নানা বাধা বিপত্তির মুখে যে খিলাফত শতবর্ষ ধরে টিকে আছে এর প্রতিষ্ঠার পেছনে যে পবিত্র ব্যক্তিসত্তা রয়েছেন তিনি কি মিথ্যাবাদী হতে পারেন, দয়া করে খোদার ওয়াস্তে একটু চিন্তা করে দেখবেন কি? নচেৎ এ বিষয়টি যেদিন মহান খোদার দরবারে উপস্থাপন করা হবে তখন আপনার কি জবাব হবে তা দেশবাসীকে দয়া করে জানাবেন কি?

প্রসঙ্গত বলতে চাই, বিগত শতাব্দী এবং এ শতাব্দীতেও খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্যে জোরদার আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু তা সফলতার মুখ দেখেনি। কিন্তু যে খিলাফত আজ শতবর্ষ ধরে আল্লাহ্‌র নামের দোহাই দিয়ে টিকে আছে একে সত্য বলে গ্রহণ না করাটা আল্লাহ্‌র কাছে যে পসন্দনীয় হবে না তা জোর দিয়ে বলা যায়।

কুরআন করীম বুঝার এবং উপলব্ধি করার প্রসঙ্গে মৌলভী আবুল আলা মৌদূদী সাহেব খুব সুন্দর একটি নীতি নির্ধারণী বক্তব্য রেখেছেন তার তফহীমুল কুরআনের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায়। বক্তব্যটি এরূপ ঃ

"বস্তুত কুরআন উপলব্ধি করা তখনই সহজ হইতে পারে, যদি আপনি উহা লইয়া উঠেন এবং বিশ্ব মানবকে আহ্বান জানাইবার কাজ বাস্তব ক্ষেত্রে শুরু করেন। অতঃপর আপনার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, প্রত্যেকটি কার্যক্রম এই কুরআন অনুযায়ী হইলে ইহা অবতীর্ণ হওয়ার সময় তখনকার লোকদের যে

বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল, আপনার জীবনেও তাহাই লাভ হওয়া সম্ভব হইতে পারে। অতএব মক্কা, আবিসিনিয়া ও তায়েফের কঠিনতম অধ্যায়গুলি এক-এক করিয়া আপনার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে। বদর ওহোদ হইতে শুরু করিয়া হোনায়েন এবং তাবুক পর্যন্ত প্রত্যেকটি অধ্যায়ই সম্মুখে হাজির হইবে। আবু জেহেল ও আবু লাহাবের মত লোকদের সহিতও আপনার মুকাবিলা হইবে। বহু মুনাফেক ও ইয়াহুদী জাতির সহিতও আপনার সাক্ষাত ঘটিবে এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের হইতে শুরু করিয়া যাহাদের মন যোগানো হইয়াছে এমন সব লোক পর্যন্ত সকল প্রকারের মানুষের সহিতই সাক্ষাৎ ঘটিবে। বস্তুত ইহা এমন এক প্রকারের সাধনা, যাহাকে আমি 'কুরআনী' সাধনা' নামে অভিহিত করিতে চাই। এই সাধনার বাস্তব ফল এই যে, এই পথে যতই অগ্রসর হইবেন, কুরআনের অনেক আয়াত এবং অনেক পূর্ণ সূরা সম্মুখে আসিয়া স্বতঃই জানাইতে থাকিবে যে, উহা এইরূপ অবস্থায় এই বাণী লইয়া নাযিল হইয়াছিল। এই পথে কুরআনের কোন কোন শব্দ কিংবা কোন তত্ত্ব পথিকের দৃষ্টির আড়ালে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু কুরআন তাহার সমগ্র অন্তর্নিহিত ভাবধারা যে তাহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই" (২২ পৃষ্ঠা, আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক মার্চ ১৯৮৩ সনে প্রকাশিত)।

মৌলভী সাহেবের উদারহণটি খুবই সুন্দর তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এজন্যে তাকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারছি না। কিন্তু এ বন্ধুর পথে পদচারণা করতে গোটা বিশ্বে আহমদী জামা্ত ছাড়া আর কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। তিনি হয়ত তার জামাআতকে লক্ষ্য করে এ বর্ণনাটি উপস্থাপন করে থাকবেন। কিন্তু এটা তার জামাআত হতে পারে না। এটা এমন একটি জামাআত যার পেছনে একজন ঐশী প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ রয়েছেন যিনি কুরআন করীম হাতে নিয়ে উঠেছেন। এখানে 'উঠেছেন' শব্দের প্রতি একটু লক্ষ্য করা আবশ্যক। আরবীতে এর অনুরূপ শব্দ হলো বা **'আছা,** এ শব্দটি যার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হয়ে থাকেন। এ কথা আমাদেরকে নিম্নোক্ত হাদীসটি স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ

ইন্নাল্লাহা ইয়াব'আছু লি হাযিহিল উম্মাতি আলা রা'সি কুল্লি মিয়াতি সানাতিন মাঁইইউজাদ্দিদুলাহা দীনাহা–অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এ উম্মতের জন্যে এমন মহাপুরুষ আবির্ভূত করবেন (অন্য কথায় উঠাবেন বা দাঁড় করাবেন–প্রবন্ধকার) যিনি তাদের জন্যে ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন (আবূদাউদ, কিতাবুল মাহদী)।

সত্যিকথা বলতে কি মৌলভী সাহেব বা তার দলের কেউ এমন দাবী করেন নি। আর আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া এমন দাবী করার ধৃষ্টতাই বা দেখাবেন কি করে? এমন দাবী করেছেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)। তিনি আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে এ দাবী করেছেন এবং কুরআনের প্রচার ও প্রসারের কাজ সারা জীবন করে গেছেন।

তাঁর জামাআতও এখন করে যাচ্ছে এবং করতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। মৌলভী মৌদূদী সাহেব তার উপরোক্ত বক্তব্যে যে চিত্র এঁকেছেন তা আমরা আহমদী জামাআতের মাঝেই দেখতে পাই। এ চিত্র দেখতে পাই **১৯৩৪** সনে, **১৯৫৩** সনে, **১৯৭৪** সনে এবং **১৯৮৪** সনে। এ চিত্র দেখতে পাই ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে এবং ইন্দোনেশিয়ায়। প্রত্যেক ইতিহাস পাঠক সচেতন ব্যক্তি এ ব্যাপারে অবহিত। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় শুধু ইঙ্গিত করলাম মাত্র। বিশেষ আর কোন জামাআতের বিরুদ্ধে বদর উহুদ হুনায়ন প্রভৃতির ন্যায় যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হয় হয়নি। তায়েফ ও আবিসিনিয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয় নি। সারা বিশ্বে অসংখ্য নিষ্পাপ আহমদী শাহাদতের পেয়ালা পান করে ধন্য হয়েছেন। মক্কার কাফিররা যেভাবে মুসলমানদের পবিত্র কলেমা পড়তে ও আল্লাহ্‌র নাম নিতে বাধা দিয়েছিল তেমনি বাধা আহমদী জামাআত ছাড়া আর কাউকে দেয়া হয়নি। আর আল্লাহ্‌র ফযলে এ জামাআত পর্বতসম একটার পর একটা বাধা ডিঙ্গিয়ে আজ বিশ্বের **১৯৩**টি দেশে ইসলামের কলেমার ঝান্ডা তৌহীদের ঝান্ডা নিয়ে কুরআন প্রচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং ৬৮টিরও অধিক ভাষায় কুরআন প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এর সফলতার প্রমাণ এমটিএ এবং এর মাধ্যমে প্রচারিত বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত জুবিলী জলসাগুলো। আলহামদুলিল্লাহ্ আলা যালিক। সুতরাং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা বলা যায় আজকের বিশ্বে কুরআন যদি কেউ বুঝে থাকে এবং হাতে নিয়ে 'উঠে' থাকে তাহলে তা হলো আহমদী জামাআত।

কুরআন তফসীরের মূলনীতি বা মানদন্ড

যুগ ইমাম হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর বিখ্যাত 'বারাকাতুদ্দোয়া' পুস্তকে কুরআনের তফসীরের যে মূলনীতি বর্ণনা করেছেন

তা সংক্ষেপে নিজ ভাষায় বর্ণনা করছি ঃ

তফসীরের ব্যাখ্যার প্রথম নীতিনির্ধারক ও মানদন্ড হলো কুরআন করীম স্বয়ং নিজেই। কুরআনের যে কোন একটি আয়াতের অর্থ কুরআনেরই অন্যান্য আয়াতে পাওয়া যায়। কুরআন যেন একটি পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ অট্টালিকা। কুরআনের এমন কোন উক্তি নেই, যার সাহায্যের জন্যে কুরআনের আরও ১০/২০ টি স্থানে অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায় না। কুরআনের একাংশ অন্য অংশের বিপরীত হতে পারে এটাও অসম্ভব। সত্য ও সঠিক অর্থের চিহ্ন হলো এটাই যে কুরআন করীমের মাঝেই এর সাক্ষ্যদাতা এক বাহিনী মজুদ আছে।

কুরআনকে সবচেয়ে অধিক বুঝতেন আমাদের প্রিয় ও সম্মানিত নবী রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। এ প্রসঙ্গে কেউ সন্দেহ করতে পারে না। তাই তিনি (সা.) যে সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন বলে জানা যায় তা-ই সঠিক। যে অর্থ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলয়হে ওয়া সাল্লাম করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় প্রত্যেক মুসলমানের তা বিনা দ্বিধায় ও বিনা সংশয়ে গ্রহণ ও মান্য করা আবশ্যক।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম তাঁর (সা.) কাছ থেকে সরাসরি আধ্যাত্মিক জ্যোতি লাভ করেছিলেন। যে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি বিতরণের জন্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন তা গ্রহণ করার জন্যে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন প্রথম সারিতে। তারাই খোদা তাআলার বিশেষ অনুগ্রহভাজন। পবিত্র কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে সহায়তা করার জন্যে খোদা তাআলার সাহায্য ছিল তাদের নিত্য সহচর। তাঁরা শুধু পাঠ করতেন আর অর্থ করতেন এমন নয় তাঁদের জীবন যাপন পদ্ধতিও ছিল কুরআন সম্মত। কুরআনের প্রতিটি অংশ তাদের কাজকর্মে প্রতিফলিত হতো। তাঁরা ছিলেন কুরাআনের আলোকে দীপ্তিমান।

কুরআন করীমের যে কোন অংশের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বুঝতে হলে এর পাঠককে পরিস্রুত আত্মা নিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। কেননা, কুরআনের আয়াত–**লাইয়ামাস্সুহূ ইল্লাল মুতাহ্হারূন** অর্থাৎ পূত পবিত্র না হলে কেউই একে স্পর্শ করতে পারে না (৫৬ ঃ ৮০) অনুযায়ী কুরআন এবং পরিস্রুত আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পবিত্র কুরআনের সত্যগুলো কেবল তাদেরই কাছে আত্ম প্রকাশ করে থাকে যারা পবিত্র ও নির্মল হৃদয় নিয়ে একে বুঝতে চেষ্টা করে। আত্মার জ্যোতি মূল্যবান নীতিনির্ধারক পার্থক্যকারী। এর মাধ্যমে সঠিক অর্থে পৌঁছানো যায়। ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে কুরআনের অর্থ করতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। এবং বলেছেন–**মান ফাস্সারাল কুরআনা বিরা'ইহি ফা আসাবা ফাক্বাদ আখতারা** অর্থাৎ যে কেবল নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছে এবং নিজ ধারণায় উত্তম করেছে তবুও সে অপব্যাখ্যা করেছে।

কুরআনের সঠিক তফসীরের মানদন্ড হিসেবে আরবী অভিধানও রয়েছে। কিন্তু কুরআন করীম নিজের মাঝে এত উপরকণ সন্নিবেশ করে দিয়েছে যে এরকম আরবী অভিধানের প্রয়োজন নেই। তবে অধিক অন্তর্দৃষ্টি লাভের খাতিরে নিঃসন্দেহে অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। বরং কখনো কখনো কুরআন করীমের গোপন রহস্যের প্রতি অভিধান নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে দেয় এবং একটি তত্ত্ব বের হয়ে আসে। আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাকে উপলব্ধি করার জন্যে জড় জগতের ব্যবস্থাদিও রয়েছে। কেননা, খোদা তাআলার উভয় বিধিমালা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এথেকে পথনির্দেশনা নেয়া যেতে পারে।

ওলী আল্লাহ্গণের ওহী-ইলহাম এবং মুহাদ্দাসগণের কাশ্ফ বা দিব্যদর্শন। এ মানদন্ডই সবচেয়ে অধিক প্রামাণিক। কেননা, ওহীপ্রাপ্ত মুহাদ্দাস নবীর ভূমিকাই পালন করে থাকেন। তাকে নবুওয়ত ছাড়া ধর্মের পুনরুজ্জীবনে সব আদেশই দেয়া হয়ে থাকে। যাঁরা আল্লাহ্র বাণী লাভ করেন তাঁরাই মুহাদ্দাস। তাঁদের মন ও আত্মা নবীগণের মন ও আত্মার সাথে নিগুঢ়ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নবুওয়তের স্বরূপকে জানার চিরস্থায়ী উপায় ও চিহ্ন হিসেবে তাদের অভিজ্ঞতা কাজ করে থাকে (পৃষ্ঠা ২৬-৩০)।

আমরা পুনরায় আমাদের গোড়ার আলোচনায় ফিরে এসে বলতে চাই, কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে ওহী ও ইলহামের জ্ঞানের প্রয়োজন। আর আল্লাহ্ তাআলা এ সৌভাগ্য কেবল তাঁর প্রিয় ব্যক্তিগণকেই দিয়ে থাকেন। কেবল পার্থিব জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে যে কেউ সঠিকভাবে কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। আমরা মহান আল্লাহ্র কাছেই তাঁর পবিত্র কলাম কুরআনে মজীদ বুঝার ও উপলব্ধি করার সাহায্য ভিক্ষা করি।

"কুরআন বুঝিতে চাহ?
দুনিয়ার ভোগী হয়ে হয় না যে এ কাজ সাধন,
এই শরবতের স্বাদ, তাহাদেরই তরে, আগে যারা পেয়েছে কিছু আস্বাদন।"

–বারাকাতুদ্দোয়া

(চলবে)

ইসলামে খিলাফত

(১ম কিস্তি)

মূল ঃ **ফরিদ আহমদ** (যুক্তরাজ্য)

অনুবাদ–**জামালউদ্দিন আহমদ সৌরভ**

ভূমিকা

মুসলমান জাতির মধ্যে বর্তমানে একক বিশ্বাসযোগ্য ও কর্তৃত্বধারী নেতৃত্ব অনুপস্থিত যদিও এটা তাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দিনে দিনে বিশ্ব একটি গোলযোগপূর্ণ অবস্থার দিকে যাচ্ছে বিশেষতঃ মুসলমানগণ এ সময়ে মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রথমত তাদের বিরুদ্ধে যে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তার জন্য আর দ্বিতীয়ত কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুধাবন করতে না পারার জন্য। সবচেয়ে বেশী শান্তি ও নিরাপদে যাদের থাকার কথা সেই মুসলমানদেরকেই শান্তির সন্ধান করতে হচ্ছে। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক অর্জন সত্ত্বেও তারা এখন লোকসানের সম্মুখীন।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা এমন নেতৃত্বের জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে যা শুধু খিলাফতের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা খিলাফতের সম্ভাবনার দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ তারা মহানবী (সা.) এর পর নবুওয়তের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে, যদিও খিলাফত নবুওয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট।

কুরআনে খিলাফত

‘খলীফা’ একটি আরবী শব্দ যার আভিধানিক অর্থ উত্তরসূরী, প্রতিনিধি। খলীফা শব্দটি কুরআনে বেশ কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের সাথে এটি দুই ভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। প্রথমত সাধারণভাবে একদল লোকের ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়ত একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে

যিনি কিনা অন্যদের নেতৃত্ব প্রদান করবেন। প্রথম ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কোন জাতির উত্তরাধিকারী বুঝাতে সমষ্টিগত অর্থে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একজন খলীফাকে নির্দেশ করে যিনি আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক মনোনীত।

কারো পক্ষে কি খিলাফতের স্থায়ী রূপ দেয়া সম্ভব ঃ

কারো কারো মতে খিলাফতের মূল অর্থ সমষ্টিগত ও সাধারণভাবে আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন সংগঠন, যেখানে একজন পরিচালক থাকেন। যার কাজ মানুষকে নেতৃত্ব দেয়া। আবার অন্য অনেকের মতে সম্মিলিতভাবে একটি দলকে নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব দেয়া। তারা এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখায় যে কুরআনে কোন কোন আয়াতে খলীফা শব্দটি বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, যা কিনা কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তির বদলে সমষ্টিগত অর্থ প্রকাশ করে। উদাহরণ হিসেবে সূরা আন নূর-এর ৫৬ আয়াত, বলা হয়েছে, ‘তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে নিযুক্ত করেছিলেন......’

যাই হোক খলীফা’র সমষ্টিগত অর্থ বুঝাতে উপরোক্ত আয়াতের ব্যবহার তাদের কুরআনের অসম্পূর্ণ ও ভাসা ভাসা জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। কুরআনে বহুবচন ব্যবহারের মানে এই নয় যে তা সমস্ত লোকের বর্ণনা করে। মাওলানা শেখ মুবারক আহমদ সাহেব তার ‘An Exposition of Some Criticisms Against Khilafat-i-Rashida’ বই এ কুরআনের সূরা আল মায়েদা’র **২১** নং আয়াত ব্যবহার করে এর একটি কড়া জবাব দিয়েছেন। এখানে আল্লাহ্ বলেছেন, ‘এবং (স্মরণ কর) যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিল, হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র সেই নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবীগণকে মনোনীত করেছিলেন এবং তোমাদের বাদশাহ্ করেছিলেন......’

শেখ মুবারক আহমদ সাহেব এর ব্যাখ্যা করেন, ‘এখানে সেই সব লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা নবী এবং বাদশাহ্ মনোনীত করার নেয়ামত স্মরণ করেছিল। যদিও এটা জানা কথা যে, সব লোক এত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিল না বরং সাধারণ লোকদের এক বিরাট অংশ ছিল। এটা প্রমাণ করে যে যদিও প্রতিশ্রুতি সমষ্টিগতভাবেই বর্ণিত হয়েছে, তা পূর্ণতা পেয়েছে স্বতন্ত্র অর্থে। সেই সাথে সূরা আন নূরে এই আয়াতটি এর ব্যাখ্যায় সাহায্য করে যেখানে বলা আছে, ‘তিনি অবশ্যই তাদের পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন।’

তাই বলা যায় অতীতে কোন সংঘবদ্ধ দলকে যদি খিলাফতের দায়িত্ব দেয়া হতো, তাহলেই এখন কেউ এরকম আশা করতে পারে। কিন্তু খলীফাগণ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা সাফল্য লাভ করেছিলেন এবং একই প্রক্রিয়া ভবিষ্যতেও চালু থাকবে। ‘যেভাবে তিনি খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন’ –বাক্যাংশ দ্বারাই এ বিষয়ে

সব সন্দেহের অবসান ঘটে।

মাওলানা শেখ মুবারক আহমদ সাহেব আরো উল্লেখ করেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তাআলা আরো একবার খিলাফতের তাৎপর্য প্রদর্শন করেন। যা কিনা দলবদ্ধ সংগঠন নয় বরং স্বতন্ত্র খিলাফতের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ এবং এমনটা ঘটতোনা যদি আল্লাহ্ না চাইতেন।

আরো একটি যুক্তি এই ব্যাখ্যাকে জোড়ালো ভাবে সমর্থন করে। কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আ.) এবং হযরত দাউদ (আ.)-এর ক্ষেত্রে খলীফা শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যাদের দায়িত্ব লোকদের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দেয়া। এই কথার সাথে মহানবী (সা.)-এর কথাও যুক্ত করুন, যিনি কুরআন সবচেয়ে ভাল বুঝতেন। তিনি (সা.) প্রত্যাশা করতেন যে তাঁর মৃত্যুর পর একজন খলীফা হবেন এবং মুসলমানদের নেতৃত্ব দিবেন।

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তোমাদের আমীর যদি হাবশী কৃতদাসও হয় তার আনুগত্য কর। এমন সময় আসছে, আমার পরে যারা থাকবে, চরম বিশৃংখলার সাক্ষী হবে। তোমরা তখন অবশ্যই আমার সঠিক নির্দেশনা প্রাপ্ত খলীফাদের অনুসরণ করবে এবং দৃঢ়ভাবে একে ধরে রাখবে......।' এটাও জানা যায় যে তিনি খলীফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্র প্রতি তাঁর বিশ্বাসের দরুন তিনি তা প্রত্যাহার করেন। এথেকে আমরা জানতে পারি, মহানবী (সা.) খলীফা শব্দের অর্থ করেছিলেন একক বা স্বতন্ত্র নেতৃত্ব। তিনি যদি খলীফা বলতে কোন সংস্থা বুঝতেন তাহলে তাঁর মৃত্যুর পর নেতৃত্বের ব্যাপারে চিন্তা করতেন না কিংবা খলীফা হিসেবে কারো নামও প্রস্তাব করতেন না। অতএব, এটা সহজেই বুঝা যায় যে সূরা আন নূর-এ মুসলমানদের জন্য খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে ইসলাম পূর্ব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই। তা এই যে একজন খলীফা মনোনীত হবেন এবং মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

খিলাফত ও নবুওয়ত

খিলাফতের ধারণা কুরআনে আরো বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) তাঁর তফসীরে কুরআন-এ উল্লেখ করেছেন, 'কুরআনে তিন প্রকার খলীফার কথা বলা হয়েছে।

(১) **সেই খলীফাগণ যারা নবী ছিলেন** যেমন হযরত আদম (আ.) এবং হযরত দাউদ (আ.)। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে বলেছেন, 'আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি' (২ ঃ ৩১)। এবং হযরত দাউদ (আ.) সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করেছি....' (৩৮ঃ২৭)।

(২) **নবীগণ যারা খলীফা ছিলেন** তাদের পূর্ববর্তী কোন মহান নবীর। যেমন ইসরাঈলীয় নবীগণ সকলেই হযরত মূসা (আ.)-এর খলীফা ছিলেন। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমরা তওরাত নাযিল করেছিলাম তাতে হেদায়াত এবং নূর ছিল, এর দ্বারা নবীগণ যারা আত্মসমর্পণকারী ছিল, ইহুদীদের জন্য ফয়সালা করত...' (৫ঃ ৪৫)।

(৩) **নবুওয়ত বিহীন খলীফা** যারা একজন নবীর পর তার উম্মতের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নবীর আদর্শ ও শিক্ষাকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা।

যেমন কুরআনে বলা হয়েছে, '......এর দ্বারা নবীগণ যারা আত্মসমর্পণকারী ছিল ইহুদীদের জন্য ফয়সালা করতো, যেহেতু তাদের উপর আল্লাহ্র কিতাবের হিফাযতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং তারা এর তত্ত্বাবধায়ক ছিল.......'(৫ঃ৪৫)

এ ধরনের খলীফাদের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীন অন্তর্ভুক্ত, কেননা তখন কোন নবী বিদ্যমান ছিল না কিন্তু তারা মুসলমানদের খলীফা ছিলেন। মহানবী (সা.) এর উত্তরাধিকারী এবং শাসক হিসেবে তাদের প্রতি কেউ কোন আপত্তি উত্থাপন করে নি। এতে আশ্চর্য হবারও কিছু নেই, কেননা তারা মহানবী (সা.) এর চিন্তাধারার ধারক ও বাহক ছিলেন। উপরের বর্ণনা হতে এটা স্পষ্ট যে নবুওয়ত ও খিলাফতের মধ্যে এক মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে। কুরআন যখন মানুষের নেতা হিসেবে খলীফাদের কথা উল্লেখ করেছে, তখন আমরা দেখতে পাই যে, খলীফাগণ নবুওয়তের সাথে অন্তর্নিহিতভাবে সম্পর্কিত। তারা নিজেরা নবী ছিলেন বা পূর্ববর্তী নবীর বিশেষ উম্মত ছিলেন। প্রথম ক্ষেত্রে নবুওয়ত খলীফার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আর খলীফাগণ যারা পূর্ববর্তী মহান নবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন তারাও সেই নবীর সম্বন্ধে লোকদেরকে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করেন। শরিয়া মোতাবেকও এই যোগসূত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়।

খলীফাগণ যারা নবী ছিলেন না তাদের উদাহরণ মূসায়ী বিধান হতেও পাওয়া যায়। যেমন যশোয়া মূসা (আ.) এর খলীফা এবং পিটার ঈসা (আ.)-এর খলীফা ছিলেন।

মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর এই ধরনের খিলাফত নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত আবু বকর (রা.) মুসলমানদের প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন। মুসলমানদের মাঝে এই ঐশী খিলাফত ২৯ বছর স্থায়ী হয় যা হযরত আলী (রা.)-এর সময়কাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

বর্তমানে খিলাফতের সম্ভাব্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা বিচারের পূর্বে আমরা যদি খিলাফতে রাশিদার সময়কালের প্রতি সংক্ষিপ্ত নজর দিই তবে দেখি কীভাবে তারা সকলেই কুরআন এবং হাদীসের শিক্ষা উপলব্ধি করেছিলেন।

মহিমান্বিত খিলাফতে রাশিদা
(৬৩২ ঈসাব্দ–৬৬১ ঈসাব্দ)

এখানে এই মহিমান্বিত যুগের অর্জন সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো এই খিলাফত আল্লাহ্ তাআলার আশীর্বাদ প্রাপ্ত ছিল। এবং বহু কঠিন অবস্থায় তারা এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যা পরিশেষে মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর ছিল।

ক্যারেন আর্মস্ট্রং প্রথম চারজন খলীফা সম্বন্ধে লিখেছেন,

'তারা সকলেই মহানবী (সা.) এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন এবং মক্কা ও মদীনাতে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছেন। তারা 'রাশিদুন' নামে পরিচিত। তাদের শাসনামল তেমনই বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিল যেমনটা ছিল মহানবী (সা.)-এর সময়। মুসলমানরা সব সময়ই শ্রদ্ধাভরে তাদের স্মরণ করে। তারা যেভাবে সে সময় অনুকূল ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তা থেকে তাদের অসাধারণ ধর্মজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই চারজন খলীফার ব্যক্তিগত গুণাবলীও এমনই ছিল যে, তা পরবর্তী মুসলিম প্রজন্মের জন্য উদাহরণ হয়ে রয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তিনি একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন (মূলত পুরুষদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম)। কিন্তু সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে বৈশিষ্ট্য যা তাকে অনন্য করেছে, তা হচ্ছে, খলীফা হিসেবে একমাত্র তার কথাই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে (নামে নয়, ইঙ্গিতে)। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি হিজরতের সময় মহানবী (সা.) এর সাথী ছিলেন। তার খিলাফত দুই বছর স্থায়ী ছিল। মহানবী (সা.) এর মৃত্যুর পর মুসলমানদের মাঝে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণ করতেই এর অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়। 'রিদ্দাহ (মুরতাদ) যুদ্ধে' তিনি মুসলমানদের নেতৃত্ব দেন। যে যুদ্ধ ছিল মূলত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক, কেননা বিদ্রোহীরা তাদের বিদ্রোহকে ধর্মীয়ভাবে সত্য প্রতিপাদন করতে পারেনি। এর মাধ্যমে তিনি আরব বিশ্বকে রক্ষা করতে সমর্থ হন। তিনি পারস্যের হাত থেকেও আরবদের রক্ষা করেন এবং এক সময় পারস্যের উল্লেখযোগ্য অংশ তার শাসনাধীন হয়। তিনি তার সদাচরণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তার নিজের শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি কোন ব্যবস্থা নিতেন না। তিনি মুসলমানদের সাথে অন্যান্য উপজাতি এবং গোষ্ঠীসমূহের যে চুক্তি ছিল তা রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিলেন। তখনকার সংকটপূর্ণ অবস্থা বিবেচনা করলে তা ছিল এক বিরাট অর্জন।

হযরত উমর (রা.) দ্বিতীয় খলীফা হন। তার খিলাফত কাল দশ বছর স্থায়ী হয়েছিল (৬৩৪–৬৪৪)। তার শাসনামলে ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে, বিশেষত পারস্য এবং বাইজেন্টাইন শাসকগণ মুসলমান শাসনাধীন হয়। এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামের এই বিস্তার অস্ত্রের বলে হয়নি। ইসলামের এই বিস্তৃতি খলীফার সহজাত দায়িত্ববোধের ফলেই হয়েছিল। এবং খলীফা মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তিনিও অন্যান্য গোষ্ঠীসমূহের সাথে চুক্তি রক্ষা করেছিলেন। অনেক লোক এ সময় ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে দ্রুত গতিতে।

হযরত উমর (রা.) কে বিশেষ একটি উপাধি দেয়া হয়েছিল। তা হচ্ছে 'আমীরুল মু'মেনীন' (বিশ্বাসীগণের নেতা)। তার গভীর প্রজ্ঞা এবং ন্যায়বোধ ছিল যা তার নেতৃত্বের সহায়ক ছিল। উদাহরণস্বরূপ ৬৩৭ সালে জেরুজালেম যুদ্ধ বিজয়ের পর, ঈসা (আ.) এর সমাধি সংলগ্ন চার্চ-এ তাকে প্রার্থনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এটা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের বিজয়ের চিহ্ন এবং খৃষ্টানদের পরাজয়ের ক্ষণ নির্দেশ করছিল। তারপরও তিনি তা করেন নি এবং অন্য কোন স্থানে নামায আদায় করেন যেন খ্রিষ্টানরা মনে কষ্ট না পায়। মানুষের ভালোর জন্য তিনি সব সময় চিন্তা করতেন।

তিনি অনেক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন যা এখনো মুসলমান সমাজ অনুকরণ করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য

- মজলিসে শূরা প্রতিষ্ঠা
- রাষ্ট্রকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা (প্রশাসনের সুবিধার্থে)
- বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা এবং অর্থ আদায় ও ব্যয়ের সুব্যবস্থা করা
- হিজরী ক্যালেন্ডার চালুকরন
- আদালত প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন ভাতার প্রচলন
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণ
- কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন

তবে সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা।

তার পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত হন হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪–৬৫৬)। তার খিলাফত কালে কুরআন করীমের আদর্শ কয়েকটি কপি তৈরী করা হয় (হযরত আবু বকর (রা.) এর লিখিত কুরআন হতে)। এবং এগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। দরিদ্রদের প্রতি আচরণের জন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়। তার সময়েই প্রথম ইসলামী নৌবাহিনী গঠিত হয়।

খোলাফায়ে রাশেদীন এর সর্বশেষ খলীফা হলেন হযরত আলী (রা.) (৬৫৬–৬৬১)। তিনি মহানবী (সা.) এর

চাচাতো ভাইও ছিলেন। তার খিলাফত কালে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী নিজেরা শক্তি অর্জনের চেষ্টা করে এবং এটা একটি সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। যদিও মুসলমানদের মূল অংশ খলীফার অনুগতই ছিলো। তবে নও মুসলিমগণ একই রকম আধ্যাত্মিকতার পরিচয় দিতে পারে নি। ফলে স্পষ্টতই একটা ভাঙ্গনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। এদের কথা পবিত্র কুরআনে সূরা আল নাসর (শেষ অবতীর্ণ সূরা) এ বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে−

'যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং বিজয় আসবে, এবং তুমি লোকদের দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি পুনঃপুনঃ তওবা গ্রহণকারী।' (১১০ঃ২-৪)

যদি ইসলামের গৌরব ও সাফল্যের কথাই বলা হয় তাহলে ক্ষমা প্রার্থনার কথা কেন বলা হচ্ছে? আমরা জানি বিজয় এবং সমস্যা মহানবী (সা.) এর সময় কাল থেকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু সমস্যাগুলো প্রকট আকার ধারণ করে হযরত আলী (রা.) এর সময়। মুসলমানদের যথার্থ শিক্ষার চাহিদা এবং সে চাহিদা পূরণ করতে না পারার ফলে বহু সংখ্যক মুসলমান ইসলামের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বুঝতে বা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়। অল্প সময়ে মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করার ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। নও মুসলিমদের জন্য সেই একই রকম আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা অর্জন করা সম্ভব হয় নি। এটা মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য এক বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করে। বিশেষত বিস্তৃত মুসলিম সাম্রাজ্যে খিলাফত একটি অভিষ্ট বস্তুতে পরিণত হয় এবং এটা তাদের খিলাফতের কল্যাণ হতে দূরে সরিয়ে দেয়।

এই বিচ্যুতির দরুন মুয়াবিয়া হযরত আলী (রা.) এর পর নিজেকে খলীফা ঘোষণা করে। তার সঙ্গী হিসেবে ছিল সেই সকল লোক যারা 'খারিজী' হিসেবে পরিচিত। ত্যাগের মনোভাব ও একতার স্থলে বৈরিতা এবং ঘৃণা স্থান দখল করে এবং এর ফলে মহানবী (সা.) এর সময়কার অবস্থা আবার তৈরি হওয়ার পথ কঠিন করে দেয়।

খুলাফায়ে রাশিদীনের সেই সোনালী রজ্জু যা সকলকে একই বাঁধনে বেঁধেছিল তা হচ্ছে ইসলামের প্রতি তাদের অপরিসীম আনুগত্য। সেই সাথে তাদের মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মহানবী (সা.) এর শিক্ষা সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারা। খিলাফতের মর্যাদার পরিপন্থী কোন কিছু করার চিন্তাও তারা করতেন না। প্রয়োজনে এর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত ছিলেন। এই আনুগত্য তাদের বিরাট সাফল্য এনে দেয়। সেই সাথে তারা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখিও হয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাদের বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন এবং খিলাফতের ঐশী দায়িত্ব পালনে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার কথা চিন্তা করতেন না। এবং খোলাফায়ে রাশিদীনদের নেতৃত্বের প্রতি কোন মোহ ছিল না, কিন্তু তারা আল্লাহ্‌ তাআলা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব চরম নিষ্ঠার সাথে পালন করেছিলেন।

কিন্তু মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সাথে সাথে সেইসব লোকদের মাঝে নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা তৈরী হয় যারা দুনিয়াবী সম্মানের ভিখারী ছিলো। মুয়াবিয়ার কথায় এর প্রতিফলন ঘটে।

'আবু বকর নেতৃত্বে চায়নি.......নেতৃত্ব উমরকে চেয়েছিলো, কিন্তু উমর নেতৃত্ব চায়নি। আর আমরা, এর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছি।'

একথা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রাথমিক কালের মুসলমানদের আধ্যাত্মিকতা কোন পর্যায়ের ছিলো যা তাদের খলীফার অনুগত করেছে। মহানবী (সা.) আরবদের মাঝে এক অসাধারণ বিপ্লব সাধিত করেছিলেন। তাদের জাতিগতভাবে গর্বিত এক জাতিতে পরিণত করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি ভালোবাসা ও মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনের সৃষ্টি করেছিলেন। সাহাবাদের আদর্শ এবং কুরবানী ছিল তাদের অসাধারণ আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন। যারা ইসলামের চরম শত্রু ছিল এবং ধরনীর বুক থেকে ইসলামের নাম মুছে ফেলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল, তারাও ইসলামের তরে নিজের জীবন পর্যন্ত কুরবানী করে দেয়। এই ছিল তাদের শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা। এই অবস্থায় আমরা খিলাফত সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখি। সাহাবাদের অবস্থান ও প্রকৃতির দরুন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করে।

এটা আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতিশ্রুতি, যাতে বলা আছে খিলাফত শুধুমাত্র বিশ্বাসী এবং সৎকর্মশীলদের জন্য। মু'মিন ব্যক্তিগণ যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর কালামের উপর ঈমান এনেছিল, তারা কিছুদিন একীভূত ছিল। যখন ঈমানের দুর্বলতা দেখা দেয় তখনই খিলাফত তাদের কাছ হতে উঠিয়ে নেয়া হয়।

(রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্‌স্‌ অক্টোবর ২০০৭ সংখ্যা)

বিবি খাদিজার সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর শুভ পরিণয়

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

মহানবী (সা.) তাঁর প্রথম জীবনসঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করেন তখনকার আরবের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা খালেদ বিন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জা বিন কুসাই এর কন্যা বিবি খাদিজাকে। তিনি যেমন ছিলেন বিদুষী, তেমনি ছিলেন ধনী। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর সাথে বিবাহের পূর্বে তাঁর (রা.) দু'বার বিবাহ হয়। নাব্বাস নামক এক আমিরের সাথে বিবি খাদিজার প্রথম বিবাহ হয়। নাব্বাসের ঔরসে দুই পুত্র 'হালা' ও 'হেন্দ' জন্মগ্রহণ করেন। 'হালা' অল্প বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করে। 'হেন্দ' জীবিত ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবীর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। ইয়াওমুল জমনের যুদ্ধে তিনি হযরত আলী (রা.)-এর সহযোগী হয়ে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করে সমর ক্ষেত্রে শাহাদত বরণ করেন। হযরত রসূল করীম (সা.)-এর জীবনের বহু ঘটনার সাথে এই বীরের নাম রয়েছে।

বিবি খাদিজা (রা.) বেশি দিন পতি সোহাগ ও সুখ উপভোগ করতে পারেননি। যৌবন সীমা অতিক্রম হতে না হতেই তাঁর প্রথম স্বামী নাব্বাস পরলোক গমন করেন। একদিকে পুত্র শোক অন্যদিকে বৈধব্যের মর্মভেদী বেদনা তাঁর হাসি মাধুরী কেড়ে নিল। কিছুদিন বৈধব্য জীবন কাটানোর পর আতিক বিন আবিদের সাথে আবার দ্বিতীয় বিবাহ হয়। আতিক বিন আবিদ ছিলেন সম্পদশালী একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তার সাথে বিবি খাদিজার যথেষ্ট সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু 'হেন্দা' নামী এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর আতিক বিন আবিদও বিবি খাদিজাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে বহু ধনসম্পদ রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন। বিবি খাদিজা তার দ্বিতীয় স্বামী আতিক বিন আবিদের রেখে যাওয়া সকল ধন সম্পদের উত্তরাধিকারী হন।

বিবি খাদিজার রূপ ছিল, ঐশ্বর্য ছিল, প্রতিপত্তি ছিল। এ যেন বিশ্ব বিধাতার ইঙ্গিতে একাধিকবার বৈধব্যের দীনতা তার ললাটে নানান দুঃখের নিষ্পেষণে সেই সুখ লালিত্য ধনীর দুলালীকে হযরত নবী করীম (সা.)-এর উপযুক্ত সঙ্গিনীরূপে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন। তা নাহলে তিনি জগতের পূর্ণ আদর্শ রমণী হবেন কিরূপে? এরপর বহু আরব ধনী বণিক তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। পরিশেষে অন্তরে বরণ করলেন এক সম্পদহীন যুবককে। এখানে বিবি খাদিজার দূরদর্শিতা অতি প্রশংসনীয়। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জাগতিক ধনসম্পদের প্রতি লক্ষ্য করেননি। লক্ষ্য করেছিলেন চারিত্রিক অগাধগুণরাশির প্রতি । তৎকালীন আরবে এমন একজন যুবকও ছিল না যাকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যে কোন একটি গুণের সাথে তুলনা করা যায়। বিবি খাদিজা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গুণাবলী জানতে পেরে তাঁর ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনার জন্য এমন একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছিলেন। যখন আবু তালিব জানতে পারলেন বিবি খাদিজা একজন বিশ্বস্ত লোক খোঁজ করছেন, তখন তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম প্রস্তাব করেন। একদা আবু তালেবের ভগ্নি বিবি আতিকা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সাথে নিয়ে বিবি খাদিজার আবাসে গেলেন এবং বিবি খাদিজার নিকট তার পরিচয় প্রদান করে কর্ম গ্রহণের প্রস্তাব করলেন, বিবি খাদিজা আবু তালিবের ভগ্নি বিবি আতিকাকে অতি সমাদার করে বললেন, আমি এই যুবকের গুণাবলী পূর্বে অনেক শুনেছি। আমি স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁকে গ্রহণ করবো এবং অপরের অপেক্ষা অধিক বেতনে নিযুক্ত করবো। আপনি তাকে পাঠিয়ে দিবেন। বিবি আতিকা শিশুকাল থেকেই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। গৃহে ফিরে এসে আবু তালিবকে সব কথা বললেন। আবু তালিব অনেক বিবেচনা করে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সা.)কে ডেকে পাঠালেন এবং তিনি তাঁকে বিভিন্ন উপদেশ দান করেন। রসূল করীম (সা.)-কে বিবি খাদিজার কর্ম গ্রহণ করতে বললে, তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে তা গ্রহণ করেন।

নবী করীম (সা.) বিবি খাদিজার ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। প্রথমবার তিনি তাঁর কাফেলা নিয়ে সিরিয়ায় গমন করার সময় বিবি খাদিজা স্বীয় বিশ্বস্ত ভৃত্য মায়াসারকে বললেন, দেখ মাননীয় আবু তালিবের ভাতিজা মুহাম্মদ এবার তোমাদের সাথে যাচ্ছেন। সর্বদা তাঁর সেবা করবে। তাঁর আদেশ উপদেশ মত চলবে। তাঁকে কখনো কোথাও একাকী থাকতে দিবে না। তার অভাব-অসুবিধা মোচনের চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না। মায়সারা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলো। বিবি খাদিজা তার নিকট হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রবাস উপযোগী জিনিষ পত্র দিয়ে কাফেলা রওনা করালেন।

কাফেলা যথা সময় সিরিয়ার অন্তর্গত

বসরা নামক স্থানে গিয়েই সুবিধামত বাজার দর পেয়ে পণ্যসমূহ বিক্রিত করলো। বিবি খাদিজার অনুচরগণ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মহানুভবতায় অভিভূত হয়ে পড়েছিল। তারা বিবি খাদিজার আজ্ঞানুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সেবাযত্ন করতে কোন প্রকার ত্রুটি করেনি।

প্রত্যাবর্তনের পথে কাফেলা মক্কা থেকে তিন দিনের পথ দূরে থাকতেই মায়সারা একটি উষ্ট্রী সজ্জিত করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে কাফেলার আগমন সংবাদের অগ্রদূত করে বিবি খাদিজার নিকট প্রেরণ করলেন। এদিকে বিবি খাদিজা কাফেলার সংবাদের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনে তার আনন্দের সীমা রইল না। বাণিজ্য নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়েছে এবং প্রচুর ধন লাভ হয়েছে জেনে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে তাঁর পথবাহক উষ্ট্রীটি পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করলেন। কাফেলা প্রত্যাবর্তন করলে মায়সারার মুখে হযরতের অসাধারণ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, উদারতা ও বিশ্বস্ততার বিষয় অবগত হয়ে বিবি খাদিজা খুবই খুশী হলেন। মায়সারা বললো, এই যুবক মুহাম্মদ এতই ভাগ্যবান যে তাঁর সাহচর্যে আমাদের এবার কোন কষ্ট হয় নি এবং অন্যবারের চেয়ে অল্প সময়ে দ্বিগুণ মুনাফা হয়েছে। তাঁর সংস্পর্শে যে এসেছে সেই তাঁর মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়েছে এবং অপর সকল বণিক অপেক্ষা আমাদের পণ্য গ্রাহকেরা আগে এবং অধিক মূল্যে ক্রয় করে নিয়েছে। মায়সারা আরো বললো, যখন আমরা বসরার উপকণ্ঠে একটি গির্জার নিকট এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করছিলাম সেই সময় এই গির্জার অধ্যক্ষ বৃদ্ধ নাস্তুরা যুবক মুহাম্মদের অবয়ব লক্ষ করে তাঁর প্রশস্ত ললাট লোহিতাভ চক্ষু ও প্রশান্ত বদন দেখে বলেছেন, এই যুবক একজন অসাধারণ লোক হবে সন্দেহ নাই। যে ভাবী পয়গম্বরের লক্ষণ আমরা তওরাতে পেয়েছি, তিনি সেই ব্যক্তি হতেও পারেন। গির্জার অধ্যক্ষ নাস্তুরা তাকে সবিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তিন চার বার বিবি খাদিজার বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে গমন করেন। প্রতিবারই তার সত্যতা সাধুতা ব্যক্তিত্ব ও বিচক্ষণতার পরিচয় পেয়ে বিবি খাদিজার অন্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি ও অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। পরিশেষে তাঁর ধৈর্যের বাধ গেল ভেঙ্গে। তিনি তাঁর সহচর নাফিসার সাথে পরামর্শ করে বিবাহের পয়গাম পাঠাতে মনস্থির করলেন। কিন্তু তাঁর মনে হলো তিনি কি এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন? তিনি বিবাহের প্রস্তাব পাঠাতে দেরী করলেন না। তাঁর সহচর নাফিসার মারফত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মত জানতে চাইলেন এবং নাফিসা সঠিকভাবেই যোগাযোগ করলো।

একদা নাফিসা হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি বিয়ে-সাদী করছেন না কেন? উত্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন, আমার কি আছে যে বিয়ে করবো? নাফিসা বললো, থাক বা না থাক তাতে কিছু যায় আসে না, আপনাকে যদি কোন পরম সুন্দরী মহিলা তাঁর মহত্ত্ব, ভালবাসা ও ধনসম্পদ সহ আমন্ত্রণ করেন তাতে আপনার বক্তব্য কি? হযরত মুহাম্মদ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন কে সেই মহিলা? এবার নাফিসা বললো, "বিবি খাদিজা"। তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন,আমি কি করে এগুতে পারি? উত্তরে নাফিসা বললো, এটা আমার কাছে। যখন প্রস্তাব এলো, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর চাচা আবু তালেবের সাথে পরামর্শ করে সানন্দ চিত্তে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তখন বিবি খাদিজার পিতা জীবিত ছিলেন না। তাঁর চাচা ওমর বিন আসাদ বিবাহের কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স তখন পঁচিশ এবং বিবি খাদিজার বয়স চল্লিশ। শুরু হলো হযরত নবী করীম (সা.)-এর জীবনের নতুন আরেক অধ্যায়।

এবার তিনি নিশ্চিন্ত মনে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার ধ্যানে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, হেরা পর্বত গুহায় কঠিন সাধনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। পরিশেষে যখন তিনি কিছু কিছু আলো পেতে লাগলেন, যা ঘটেনি কিন্তু ঘটার পথে এ সব কথা হযরত খাদিজা (রা.) কাছে বর্ণনা করতেন। হযরত খাদিজা (রা.) কিছু দিনের মধ্যেই এগুলি বাস্তবে রূপায়িত হতে দেখে তাঁর বিশ্বাস এরূপভাবে প্রগাঢ় হয়ে উঠলো যে তিনি তাঁর প্রিয়তম স্বামীকে এ বিষয়ে উৎসাহ এবং প্রেরণা দিতেন। তাতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহা সত্যের সন্ধানে নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করতে প্রেরণা ও উৎসাহ পেতেন। হেরা পর্বত গুহা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময় মরুভূমির নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে আবার ফিরে আসতেন হেরা পর্বত গুহায় এবং গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। একদা ধ্যানে মগ্ন থাকা কালে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহী বাহক জিব্‌রাঈল (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে হাজির হলেন। অতঃপর বলেন, আপনি আবৃত্তি করুন। তিনি বললেন, আমি লিখা পড়া শিখিনি। হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) তাঁকে জোরে জোরে আলিঙ্গন করে আবার বললেন, আপনি আবৃত্তি করুন। এবার হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন, আমি লিখা পড়া জানি না। তখন জিবরাঈল (আ.) তাঁকে দ্বিতীয় বার

আলিঙ্গন করে বললেন, আপনি আবৃত্তি করুন। এবার হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন, আমি পড়া লিখা জানি না। হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) সবেগে তাঁকে আলিঙ্গন করে নিজেই পবিত্র কুরআনের বাণী আবৃত্তি করতে লাগলেন, "আপনি পাঠ করুন, আপনার সেই মহান প্রভুর নামে যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, আপনার প্রভু খুবই দানশীল, যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানে না" (সূরা আলাক)। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (সা.) সুন্দরভাবে পাঠ করলেন পবিত্র বাণী।

এদিকে স্বর্গীয় দুতের আলিঙ্গনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তখনো থর থর করে কাঁপছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে পত্নী হযরত খাদিজা (রা.)কে গিয়ে বললেন, আমার গায়ে কম্বল দাও। হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢাকলেন। হযরত নবী করীম (সা.) কম্পিত কণ্ঠে বললেন, আমার ভয় হচ্ছে। যে দায়িত্ব আমার উপর আসছে, মনে হয় আমার শরীরে তা মানবে না, আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। হযরত খাদিজা (রা.) নবী করীম (সা.)-এর সাথে জীবনের পনরটি বৎসর কাটিয়েছেন। তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম। দয়াময় আল্লাহ্ কিছুতেই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি তো মানুষের কল্যাণের জন্য জীবনের সবকিছু ত্যাগ করেছেন। দুস্থ জনগণের সাহায্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। চির বিশ্বাসী আমানতদার হিসাবে দেশবাসীর কল্যাণ সাধন করেছেন, বেকারদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। আত্মীয়স্বজনের প্রতি কর্তব্য পালন করেছেন, অতিথিদের সেবা করেছেন, অনাথ, অক্ষম, অন্ধ, বিধবা অসহায়দের বোঝা বহন করেছেন। আপনার চরিত্রে এতগুলি সৎগুণ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না।" এভাবে সান্ত্বনা দিয়ে হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে আপন চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন। ওয়ারাকা বিন নওফেল তখন আরবের ধর্মপরায়ণ পন্ডিতরূপে খ্যাত। ওয়ারাকা হযরত খাদিজার মুখে সব কথা শুনে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, কুদ্দুসুন কুদ্দুসুন (পবিত্র পবিত্র)। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম। হে খাদিজা তুমি যদি আমাকে সত্য কথা বলে থাকো, তাহলে এটা তো সেই জিব্‌রাঈল ফেরেশ্‌তা যাকে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আ.)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। হায়রে কপাল! যদি আমি সেই দিন যুবক থাকতাম, যেদিন আপনি আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করবেন। হায়রে কপাল! সেই দিন যদি আমি জীবিত থাকতাম, যেদিন আপনার দেশবাসী আপনাকে দেশান্তরিত করে ছাড়বে। এই কথা শুনে হযরত মুহাম্মদ (সা.) চমকে উঠে বললেন, কি! আমাকে আমার দেশবাসী দেশান্তর করবে? ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে সত্য ধর্ম আপনি প্রচার করতে এসেছেন, সেরকম সত্য ধর্ম যাঁরাই প্রচার করেছেন, দুনিয়া তাদের শত্রুতা না করে ছাড়েনি। আমি যদি ততদিন বেঁচে থাকি, তাহলে প্রাণপণে আপনার সাহায্য করবো। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। ঘটনার অল্পদিন পরেই ওয়ারাকা পরলোক গমন করেন।

হযরত খাদিজা (রা.)-ই হলেন মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান। ইসলামের সূর্যোদয়ের প্রথম প্রভাতেই তিনি নবী করীম (সা.)-এর প্রথম জীবন সঙ্গিণী। তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার পেছনে উল্লেখযোগ্য কতগুলি কারণ রয়েছে। হযরত নবী করীম (সা.) এর প্রথম জীবনের সুনাম সুখ্যাতিতে হযরত খাদিজা (রা.) পূর্ব থেকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। সিরিয়ার বাণিজ্য সফরে সীমাহীন মুনাফা অর্জনও তাঁর ভৃত্য মায়াসারার মুখে অনেক অলৌকিক কথা শুনেছিলেন। সুদীর্ঘ পনের বছর নবীজির জীবন সঙ্গীণি থেকে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। হেরা পর্বত গুহার সকল ঘটনা নবী করীম (সা.) তাঁকে জানিয়েছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.)-এর চাচাতো ভাই ওয়ারাকার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য ও ভবিষ্যদ্বাণীও তিনি শুনেছিলেন। ইত্যাদি কারণে খাদিজা (রা.) প্রথম ইসলামের পতাকা তলে মাথা নত করেছেন। সংশয়, ভয়-ভীতি নিরাশায় পদক্ষেপেই নবী করীম (সা.) আপন স্ত্রীকে দোসর হিসেবে পেলেন, এটা ছিল নবী করীম (সা.)-এর জন্য বিরাট সাফল্য।

হযরত খাদিজা (রা.)-এর গর্ভে মহানবী (সা.)-এর তিন পুত্র এবং চার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রত্রয়ের নাম হযরত তাহের, হযরত তায়্যেব ও হযরত কাসেম। কন্যা চারজনের নাম, হযরত ফাতিমা, হযরত রোকাইয়া, হযরত যয়নাব ও হযরত উম্মে কুলসুম। হুযূর (সা.)-এর সন্তানদের সবাই হযরত খাদিজা (রা.)-এর গর্ভজাত ছিলেন। অবশ্য তাঁর তৃতীয় পুত্র হযরত ইব্রাহীম শুধু হযরত মারিয়া কিবতীয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পুত্রগণ সবাই বাল্য বয়সে ওফাতপ্রাপ্ত হন।

হিজরতের তিন বৎসর পুর্বে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজা (রা.) পরলোক গমন করেন। জান্নাতবাসী হন। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"

সীরু ফিল আরদ–ভ্রমণ কর পৃথিবীময়

ভারতের কয়েকটি ভ্রমণ স্পট

মাহমুদ আহমদ সুমন

পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি স্থানে মহান খোদা তাআলা পৃথিবীময় ভ্রমণ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

যেমন বলা হয়েছে "তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর" (সূরা রূম ঃ ৪৩)। অন্যত্র বলেন, "তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম এবং বসবাসের উপযোগী করেছেন, সুতরাং তোমরা এর বিস্তীর্ণ পথসমূহের পরিভ্রমণ কর এবং তাঁর রিয্‌ক থেকে আহার কর" (সূরা আল মূল্‌ক ঃ ১৬)।

নিজের আবাস ভূমি ত্যাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করলে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিমাণ বহুলাংশে বেড়ে যায় আর শেখা যায় অনেক কিছু। কোন ব্যক্তি শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও যদি কখনও ভ্রমণ না করে তাহলে সে যে কোন সমস্যার সম্মুখীন সহজেই হতে পারে। ভ্রমণ করলে শরীর ও মন-মানসিকতা উভয়ই ভাল থাকে।

আমাদের সবচেয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ হলো ভারত। কিন্তু আমরা কখনও এই নিকটতম দেশটিতে আকর্ষণীয় যে সব স্থান রয়েছে তা জানি না এবং জানারও ইচ্ছা রাখি না। আমরা মনে করি যে, কি দরকার আছে জেনে বা ভিন্ন দেশ ঘুরে অযথা টাকা খরচ, সময় নষ্ট ইত্যাদি। এ ধারণা যারা করে তারা আসলে অনেক বড় ভুল করে বসে, কারণ জ্ঞান অর্জণ শেষ হয় না। দেশ ভ্রমণের ফলে অনেক কিছু শেখা যায় আর নুতন নুতন অভিজ্ঞতা অর্জন হয়।

বর্তমানে আমাদের জন্য ভারত ভ্রমণ খুব সুবিধা, কারণ কোলকাতার সাথে সরাসরি বাস ও ট্রেন সার্ভিস চালু হয়েছে, এতে সময় লাগে মাত্র ১০ ঘন্টার মত। ভাড়া ও আসা যাওয়ার খরচ খুব বেশী নয়। ভারতে যেসব উল্লেখযোগ্য স্থান আছে তা জেনে আপনি ভ্রমণের সময় নির্ধারণ করে নিয়ে ভ্রমনে বের হতে পারেন। নিম্নে আকর্ষণীয় কয়েকটি ভ্রমণ স্পটের কথা উল্লেখ করা হলো ঃ

দিল্লীর শাহী মসজিদ

কোলকাতা ঃ

কোলকাতা গঙ্গার পূর্ব তীরে পশ্চিমবঙ্গেরে রাজধানী। বৃটিশদের হাতে গড়ে ওঠে, একদা রাজধানী ছিল ইংরেজ শাসিত সমগ্র ভারতে প্রায় এক কোটি লোকের বাসভূমি এই কোলকাতা, প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক শহর। কোলকাতা নগরীতে দেখার আছে অনেক কিছু, যেমন– ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা, নেহেরু চিলড্রেনস্‌ মিউজিয়াম, পাতাল ট্রেন, বেলুড় মট, নাখোদা, জোড়া সাঁকোর ঠাকুর বাড়ি, রাইটার্স বিল্ডিং, রাজভবন, ইডেন গার্ডেন, রবীন্দ্র সরোবর, ফোর্ট ইউলিয়াম, রবীন্দ্র সেতু, হুগলী সেতু, বিড়লা নভোমন্ডল, সাইন সিটি প্রভৃতি। কোলকাতায় আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের মিশন হাউজ রয়েছে ২০৫ নিউ পার্ক ষ্ট্রীট। এখানে আপনি খানিকটা সময় বিশ্রাম নিয়ে সফরের ক্লান্তি দূর করতে পারেন।

মুর্শিদাবাদ ঃ

কোলকাতা থেকে ১৯৭ কিলোমিটার দূরে মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী ছিল। ১৭০৫ সালে মুর্শিদ কুলি খাঁর হাতে শুরু হয়ে ১৭৫৭ সালে সিরাজের পতনে শেষ হয় স্বাধীন বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদের অন্যতম আকর্ষণ হাজার দুয়ারী, বড় ইমাম বাড়ী, মদিনা মসজিদ, জাফরগঞ্জ, কাটরা মসজিদ, মুর্শিদ কুলি খাঁর সমাধি, মোতিঝিল, খোষবাগ, কাশিম বাজার, রাজবাড়ি প্রভৃতি।

দার্জিলিং ঃ

কোলকাতা থেকে ৬৬৫ কি.মি. দূরে দার্জিলিং পশ্চিম বাংলার অন্যতম শৈল শহর। এখানে চারদিকে সবুজ অরণ্য পাহাড়ের ঢেউ, মাঝে দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ ছোঁয়া বরফে মোড়া রূপালী রযের কাঞ্চন জঙ্গা। ১৮৩৫ সালে ইংরেজরা দার্জিলিংকে স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে গড়ে তোলে । দার্জিলিংয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্থান ম্যাথ। এখানে একপাশে গভীর উপত্যকা। আর দূরে বরফে মোড়া কাঞ্চন জঙ্গা। এখানে দেখার আছে হিমালয়ের মাউন্টেনিয়ারিং ইনষ্টিটিউট, চিড়িয়াখানা, লেবং রেস কোর্স, টাইগারহিল প্রভৃতি।

দিল্লী ঃ

ভারতের রাজধানী শহর দিল্লীর ইতিহাস খুবই প্রাচীন। কোলকাতা থেকে দ্রুতগামী রাজধানী এক্সপ্রেস বিকাল ৪

টায় ছাড়ে, প্রায় ১৮ ঘন্টা পরে নয়া দিল্লী পৌঁছায়। পুরনো আর নতুনের সমন্বয়ে বর্তমান দিল্লী পুরোতাত্ত্বিক নিদর্শনের অন্যতম দর্শনীয় শহর। লালকেল্লা, জামে মসজিদ, চাদনীচক নিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা আজ পুরনো দিল্লী নামে পরিচিত। আর নয়া দিল্লী ষ্টেশনের দক্ষিণে কন্ট প্রেস সংসদ মার্গ, জনপথ ও বিদেশী দূতাবাস এলাকা পর্যন্ত চানক্যপুরী নিয়ে নয়াদিল্লী। দিল্লীর আকর্ষণীয় কীর্তিসমূহ হলো– কুতুব মিনার, ইন্ডিয়া গেট, রাষ্ট্রভবন, মোগল উদ্যান, পুরনো কেল্লা, হুমায়ূন স্তম্ভ, হযরত নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগা, খুনী দরওয়াজা, লালকেল্লা, শাহী মসজিদ (যেখানে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর দ্বিতীয় বিয়ের এলান হয়), রাজঘাট, দেওয়ানী খাস, খাস মহল, সম্রাট গিয়াস উদ্দিন খাঁর মাজার প্রভৃতি।

কুতুব মিনার ঃ

২শ’ ৩৯ ফুট উচু পাথরের তৈরী কুতুব মিনার, প্রাচীন ভারতের এক অপূর্ব নিদর্শন। বিশ্বের সর্বোচ্চ মিনার তৈরীর লক্ষ্যে ভারতের দিল্লীতে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে তৈরী করা হয় কুতুব মিনার। ভারতের ইসলামের বিজয় স্মারক হিসেবে গড়ে তোলা এ মিনারটিতে ইসলামিক স্থাপত্যশৈলীর অনেক নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। ভারতের রাজধানী দিল্লী শহর থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ভারতের অতি প্রাচীন আমলে গড়ে ওঠা কুওয়াত-উল ইসলাম মসজিদের পাশে তৈরী করা এই কুতুব মিনার উনিশ শতক পর্যন্ত বিশ্বের সর্বোচ্চ উঁচু মিনার অবস্থানের খেতাবটি ধরে রাখে। যার পাশেই রয়েছে আলতামিশ, আলাউদ্দীন খলজী এবং জামিমের মত বিখ্যাত ব্যক্তিদের কবর। দাস রাজবংশীয় রাজা কুতুব উদ্দীন আইবেক ১১৯৯ সালে কুওয়াত-উল ইসলাম মসজিদের পাশে কুতুব মিনারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। কুতুব উদ্দিন আইবেক ১১৯২ সালে দিল্লীর সর্বশেষ হিন্দু রাজ্য শাসক রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়ে ভারতে ইসলামের পতাকা উজ্জীবিত করেন। শুরু হয় মুসলিম শাসন। আর এ বিজয়কে স্মরণীয় কে

রাখতেই ইসলাম বিজয়ের স্মৃতিফলক হিসেবে তিনি এ মিনারটি তৈরী করেন।

দিল্লীর কুতুব মিনারের সামনে লেখক

আইবেক দিল্লীর সুলতান হিসেবে রাজমুকুট লাভ করেন। মিনারটি পাঁচতলা বিশিষ্ট এবং প্রতিটি তলাতেই সুনিপুণ কারুকাজ বেষ্টিত বেলকনি রয়েছে। তিনটি পর্যায়ে এ মিনারের নির্মাণ কাজ করা হয়। রাজা কুতুব উদ্দিন আইবেক প্রথম তলা পর্যন্ত নির্মাণ সমাপ্ত করেন। পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ তলা নির্মাণ করা হয় ১২৩০ সালে তারই জামাতা ইলতুৎ মিশের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

মিনারটি লম্বা আকৃতির লাল ও ফ্যাকাশে রঙের মত দেখতে। মিনারের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য তিনটি পথ দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ভেতরটায় প্রবেশ করে মনে হবে গভীর কোনও কূপের মধ্যে অবস্থান করছেন। কূপের যেখানে পানি থাকে সেখানে দর্শনার্থীদের অবস্থান আর উপরটা হলো মিনারটির শেষ প্রান্ত। মিনারটি নির্মাণের পরে ১৩৬৮ সালে বজ্রপাতে উপরের দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়ে। পরে ১৩৭০ সালে ফিরোজশাহ তুঘলক এটির পুনর্নির্মাণ করেন। যদিও নির্মাণ স্থপতি দ্বিতীয়বার এ মিনারটির জন্য মূল মিনারের পাশেই নতুন করে আরেকটি মিনার তৈরীর সিদ্ধান্ত নেন। তবে তার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মিনারটি আর কেউ তৈরী করেননি। এক সমীক্ষায় জানা যায়, ভারতে যেসব পর্যটক দিল্লীতে ভ্রমণ করে থাকেন তাদের প্রায় ৭৫ শতাংশ পর্যটকই কুতুব মিনারের দর্শনে আসেন।

আগ্রা ঃ

তাজমহলের অপরূপ সৌন্দর্যের জন্যে বিশ্বখ্যাত আগ্রা। ১৪৭৫ সালে রাজা বাদল শিংহের হাতে আগ্রার গোড়াপত্তন। সম্রাট আকবরের হাতেই আগ্রার সমৃদ্ধি ঘটে। জাহাঙ্গীরের আমলে আগ্রাই ছিল মোঘলদের রাজধানী। এরপর সম্রাট শাহজাহান তাজমহল নির্মাণ করেন। ১৬৬৬ সালে বৃদ্ধ বন্দী সম্রাট শাহজাহান ৭৪ বছর বয়সে তাজমহলের দিকে তাকিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আগ্রা দূর্গে। কোলকাতা থেকে আগ্রার দুরত্ব ১২৬৪ কি.মি.। ১৬৩১ সালে তাজমহলের নির্মাণ শুরু হয়ে শেষ হয় ১৬৫২ সালে। মোট ব্যায় হয় ৫০ লাখ স্বর্ণমুদ্রা। ভারত তথা বিশ্বের অন্যতম শেষ্ঠ দর্শনীয় সৌধ সমাহার এই তাজহল। আগ্রায় আরো দেখবেন দূর্গ আর ইওমদ উদ্দোলার সমাধি। আগ্রা থেকে ৩৭ কি.মি. দূরে ফতেহ পুর সিক্রি। এখানে আছে নহবৎ খানা, আঁখ মিচৌলী, তানসেন মহল প্রভৃতি।

দিল্লীতে আহমদীয়া মুসলিম জামআতের যে মিশন হাউজ রয়েছে তার সামনে দিয়েই টুরিষ্ট বাস চলাচল করে। আপনি যদি আগ্রার দিকে যান তাহলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আগ্রার সব ঐতিহাসিক স্থান দেখিয়ে আপনাকে যথাস্থানে পৌঁছে দিবে, এতে ভাড়া লাগবে ৪০০ হতে ৫০০ রুপী। আর যদি দিল্লীর লালা কেল্লা, কুতুব মিনার সহ অন্যান্য স্থান দেখতে চান তাহলে এই টুরিষ্ট বাসে খরচ পরবে ৩৫০ থেকে ৪০০ রুপী।

লক্ষ্ণৌ ঃ

গোমতী নদীর তীরে ইতিহাসের নবাবী শহর লক্ষ্ণৌ। বর্তমানে উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে যা দেখবেন তা হলো, বড় ইমামরাজা, ভুলভুলাইয়া, রুমি দরওয়াজা, ক্লাক টাওয়ার জামে মসজিদ, মার্টার মেমোরিয়াল, ছাত্তার মঞ্জিল, লক্ষণটিলা প্রভৃতি।

আজমীর ঃ

রাজ্যস্থান রাজ্যে পড়েছে আজমীর শরীফ। কললা ষ্টেশনের সামান্য উত্তরে দরগা শরীফ। সপ্তম হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী (রহ.) এর মাজার রয়েছে এখানে।

মাদ্রাজ ঃ

তামিলনাড় রাজধানী মাদ্রাজ। ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম বন্দর শহর এটি। মাদ্রাজে দেখার আছে হাইকোর্ট ভবন, ওল্ড লাইট হাউজ, কোর্ট সেন্ট জর্জ, সেন্ট মেরির চার্ট, মেরিনা সিবিচ, অ্যাকোরিয়াম প্রভৃতি। কোলকাতা থেকে এর দুরত্ব ১৬৬৩ কি.মি.।

ব্যাঙ্গলোর ঃ

কর্ণাটকের রাজধানী ব্যাঙ্গলোর। এই শহরের পত্তন ১৬ শতকের মাঝামাঝি। আধুনিক ও প্রাচীনত্ব দুইয়ে মিলে বৈচিত্রে ভরা শহর ব্যাঙ্গালোর। এখানে দেখবেন আনন্দরা ও সার্কেল, কুষণ পার্ক,

স্বর্ণমন্দিরের সামনে বসে আছেন লেখক ও তার বন্ধু মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন

হাইকোর্ট, বিধান সভা ইত্যাদি।

হায়দ্রাবাদ ঃ

একদা নিজাম শাহীর শহর হায়দ্রাবাদ বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী। গোলকন্ডার পঞ্চম সুলতান মুহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ ১৫৮৯ সালে হায়দ্রাবাদ শহরের পত্তন করেন। এখানে দেখবেন- ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভেন্কটেশ্বর মন্দির, গোলকুন্তা দুর্গ, কুতুবশাহী সমাধি ভূমি, জং মিউজিয়াম, চার মিনার মসজিদ, ওসমান সাগর, নাগাজুন সাগর প্রভৃতি।

মুম্বাই ঃ

আরব সাগরের সুনীল জলরাশির কোলে মহারাষ্ট্রের রাজী মুম্বাই। ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর শহর। কোলকাতা থেকে মুম্বাইর দুরত্ব ১৯৬৮ কি.মি.। এখানে দেখবেন গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া, সেন্ট ডানর্স চার্চ, জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারী, ভিক্টোরিয়া টারমিনাল, মাত্রত্ম জোতিকাকুল মার্কেট, কমলা নেহেরু পার্ক, বোম্বে চিড়িয়াখানা, জুহুবিচ, টাওয়ার অব সাইলেন্স, পোরওয়ালা অ্যাকুরিয়াম প্রভৃতি।

অমৃতসর ঃ

কলকাতা হতে প্রায় ১৮৭০ কি.মি. দূরত্ব হবে অমৃতসর। এখানে ঘটেছে ইতিহাসের করুন দুঃখ জনক ঘটনা, যা জলানদার নামে পরিচিত। এই স্থানে হাজার হাজার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে ইংরেজরা। এখানে অন্ধকুপ রয়েছে। অমৃতসরে দেখার মত যে জিনিষটি তা হলো স্বর্ণমন্দির। পুরো ঘরটাই স্বর্ণ দিয়ে তৈরী, চারপাশে পানি, মাঝখানে মন্দির, বিশাল এড়িয়ো জুড়ে তার অবস্থান, এটি হলো শিক সম্প্রদায়ের প্রধান উপসনালয়। রোদ্রের বেলায় মন্দিরটি দেখতে খুব সুন্দর লাগে স্বর্ণগুলো ঝলমল করে।

কাদিয়ান ঃ

অমৃত শহর থেকে খুব কাছেই কাদিয়ান অবস্থিত। কাদিয়ান হলো সেই পবিত্র স্থান যেখানে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। এখানে রয়েছে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ইমাম মাহদী (আ.)-এর সমাধি। এছাড়া উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো হচ্ছে, মসজিদে আকসা, মসজিদ মুবারক, ইমাম মাহদী (আ.)-এর উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাল কালির নিদর্শন ওয়ালা কক্ষ, বাইতুল ফিক্র, হযরত আম্মাজান (রা.)-এর দালান, বাইতুদ্ দোয়া, বাইতুর

বিয়াযত, মীনারাতুল মসীহ্, বেহেশ্তী মাকবেরা, ইমাম মাহদী (আ.)-এর জানাযাগাহ্, গোল কামরা, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর পরিবারের পূর্ব পুরুষদের কবরস্থান, মসজিদে নূর, স্যার জাফরুল্লাহ্ খান (রা.) সাহেবের বাড়ী। কাদিয়ানের পাশেই রয়েছে হুশিয়ারপুর। কাদিয়ান থেকে এর দূরত্ব ৭০ কিলোমিটার। এখানে প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.) চিল্লাকাশি করে প্রতিশ্রুত সন্তানের শুভ সংবাদ লাভ করেন।

ভারতের বেশ কিছু স্থান ভ্রমণ করার সুযোগ মহান খোদা তাআলা আমাকে দিয়েছে, তার মাঝে উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো হলো পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ানের পবিত্র স্থানগুলো, দিল্লীর লালকেল্লা, খাস মহল, কুতুব মিনার, শাহী মসজিদ, ইন্ডিয়া গ্রেট, রাজঘাট, বাহাই সেন্টার, সম্রাট গিয়াস উদ্দিন খাঁর মাজার, জামে মসজিদ, স্বর্ণ মন্দির, জলানদার, অন্ধকুপ, পাতাল ট্রেন, হুগী সেতু ইত্যাদি।

ভারত ভ্রমণ আমার কাছে খুব ভাল লেগেছে, তাই আমার মন চায় বার বার যেতে। পাঠকবৃন্দের কাছে এই আবদার করছি যাদের সামর্থ আছে তারা জেনো বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং অন্যদেশের মানুষের সাথে পরিচিত হোন।

কত খরচ হতে পারে ঃ

কোলকাতা যেতে পাসপোর্ট করার পর আপনার খরচ পরবে খুবই কম। আপনি যদি ঢাকার কমলাপুর থেকে B.R.T.C বাসে যান তাহলে যাওয়া আসা (ঢাকা-কোলকাত, কোলকাতা-ঢাকা) ১৩শ হতে ১৪শ টাকা লাগবে। আর যদি ট্রেনে যান তাহলে যাওয়া আসা ৯শ থেকে ১ হাজার টাকা লাগবে। আপনি যদি ভেঙ্গে যেমন ঢাকার গাবতলী থেকে সোহাগ, ভোলবো বা অন্যান্য পরিবহনে ঢাকা থেকে বেনাপোল যান আপনার খরচ লাগবে ৪০০-৫০০শ টাকা বেনাপোল সীমান্ত অতিক্রম করে বনগাঁও রেল ষ্টেশন থেকে কোলকাতা পর্যন্ত যেতে ভাড়া লাগবে ৪০-৫০ রুপী। এছাড়া ঢাকার গাবতলী থেকে আরও অনেক বাস যেমন ঈগল, হানিফ, দিগন্ত ঢাকা বেনাপোল চলাচল করে, এইসব পরিবহনে ২০০-২২০/- টাকা দিয়ে আপনি বেনাপোল পৌঁছতে পারবেন। দেখা যায় কোলকাতা আসা যাওয়া ২০০০/- টাকার বেশী কোন মতেই আপনার খরচ হবে না। আর ঐতিহাসিক স্থানগুলো দর্শনের হিসেব আলাদা করতে হবে।

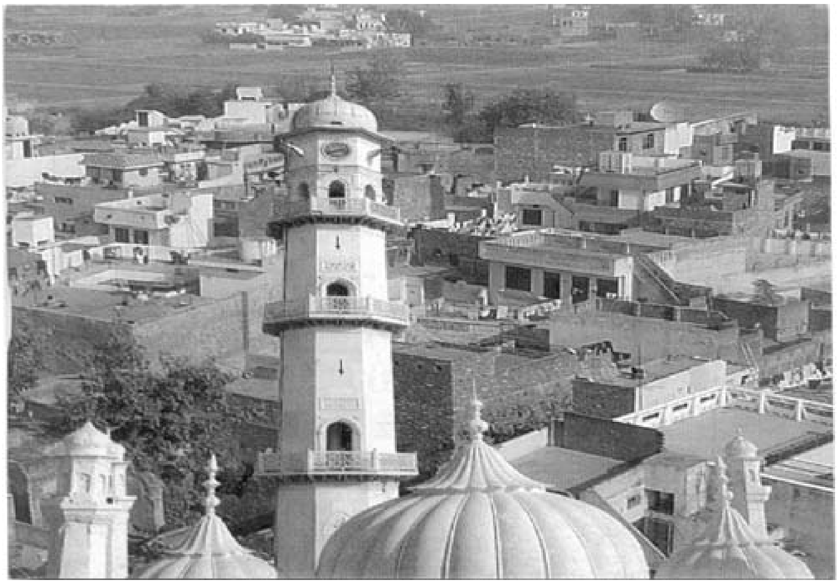

পবিত্র কাদিয়ান শহর

পাসপোর্ট ও ভিসা সম্পর্কে কিছু তথ্য ঃ

পাসপোর্ট করা এখন পূর্বের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গেছে। এখন প্রতিটি জেলা ও পোষ্ট অফিসেও পাসপোর্ট করা যায়। পাসপোর্ট করার সময় পাসপোর্ট অফিস থেকে বা পোষ্ট অফিস থেকে পাসপোর্ট আবেদন ফরম নিয়ে পূরণ করতে হবে এবং নির্ধারিত ফি সহ জমা দিতে হবে। আবেদন ফরমে নিয়মাবলী খুব সহজভাবে উল্লেখ আছে।

পাসপোর্টের ধরণ ও ফি ঃ

১। অতি জরুরী পাসপোর্ট ঃ এটি পাওয়া যাবে ৭২ ঘন্টার মধ্যে। ফি জমা দিতে হবে ৬,০০০/- টাকা। পোষ্ট অফিসের পাসপোর্ট শাখাগুলোয় এখনো অতি জরুরী পাসপোর্ট সার্ভিস চালু হয়নি। একমাত্র পাসপোর্ট অফিস থেকেই অতি জরুরী পাসপোর্ট করা যায়।

২। **জরুরী পাসপোর্ট ঃ** এটি পাওয়া যাবে ১১ থেকে ২১ দিনের মধ্যে। ফি জমা দিতে হবে ৩৫০০/- টাকা।

৩। সাধারণ পাসপোর্ট ঃ এটি পাওয়া যাবে ২১ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে। ফি জমা দিতে হবে ২৫০০/- টাকা।

৪। বিশেষ পাসপোর্ট ঃ শুধু ভারত যাওয়ার জন্য বিশেষ পাসপোর্ট করা হয়। এটি করতে ফি পড়বে ১০০০/- টাকা। এটি পাওয়া যাবে ৩০ দিনের মধ্যে। আর জরুরী পাসপোর্ট ফি জমা দিতে হবে ২০০০/- টাকা। এটি পাওয়া যাবে ২১ দিনের মধ্যে। আর অতি জরুরীর ক্ষেত্রে ফি জমা দিতে

হবে ২৫০০/- টাকা এটি পাবেন ৩ দিনের মধ্যে। পাসপোর্ট অফিস থেকেই বিশেষ পাসপোর্ট করা হয়।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঃ

পাসপোর্ট চাইলেই যে পাসপোর্ট হয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়। এজন্য প্রয়োজন হয় গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র। জেনে নিন, পাসপোর্ট করতে হলে কী কী কাগজপত্র জমা দিতে হবে।

সকল পেশার পাসপোর্ট আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য (নতুন) ঃ

২টি পাসপোর্ট ফরম পূরণ করতে হবে। প্রতিটির সাথে একটি করে পাসপোর্ট সাইজ ছবি আঠা দিয়ে লাগাতে হবে।

২টি ফরমেই ছাবর উপরে সত্যায়িত করতে হবে। (সত্যায়িত করতে পারবেন ঃ গেজেটেড কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/কলেজ শিক্ষক/উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, পৌরসভা/ উপজেলা পরিষদ / ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরকমিশনারগণ। বিস্তারিত পাসপোর্ট ফরমের পিছনের অংশে দেখুন)।

১টি পাসপোর্ট এবং ১টি ষ্ট্যাম্প সাইজ ছবি যে কোন ১টি ফরমের উপরের মাঝখানে আলাদা ভাবে সংযুক্ত করতে হবে।

যাদের শহরে বাড়ী আছে তাদের জন্য ফরমের 'ক' অংশ ছাড়াও আরো প্রয়োজন ঃ (১) স্থায়ী এবং বর্তমান ঠিকানা যেন একই হয়। (২) বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল এর ফটোকপি।

সবার জন্যই লাগবে বর্তমান ঠিকানার চেয়ারম্যান অথবা কমিশনারের সনদ।

সবার জন্যই লাগবে পেশাদারি সনদ।

অনূর্ধ্ব ৩৫ বছরের মহিলাদের ক্ষেত্রে বিয়ের কাবিননামা এবং স্বামী কর্তৃক অনুমতি পত্র।

ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পত্যয়নপত্র অথবা পরিচয় পত্রের ফটোকপি।

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এ্যাডভোকেটদের জন্য সনদ ও বার কাউন্সিলের প্রত্যয়নপত্র।

ড্রাইভার হলে ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটোকপি সত্যায়িত করে দিতে হবে।

সন্তানের ক্ষেত্রে জন্ম সার্টিফিকেট, বাবার পাসপোর্টের ফটোকপি এবং বাবার অনুমতি পত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

প্রতি জেলার ডিসি অফিসে পাসপোর্ট করা যায়।

সোনালী ব্যাংকের যেকোন ট্রেজারী শাখায় পাসপোর্ট ফি জমা দেয়ার পর যে রশিদ প্রদান করবে তা পাসপোর্ট ফরমের উপরের ডান দিকে আঠা দিয়ে লাগাতে হবে।

১২ বছরের নিচের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ০৪ কপি ষ্ট্যাম্প সাইজের ছবি লাগবে, পিতা-মাতার পাসপোর্ট ফরমের সাথে।

১ দিনে পাসপোর্ট পেতে চাইলে নিম্নোক্ত শর্ত প্রযোজ্য ঃ

১। ঢাকস্থ ডেমরা, কোতওয়ালী, সূত্রপুর, লালবাগ, কামরাঙ্গীচড় অধিবাসীরা এ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না। ঢাকা শহরের বাকী থানার অধিবাসীরাই শুধু পারবেন।

২। শুধু মাত্র ঢাকা শহরের ভোটার আইডি কার্ড ধারী এ সুবিধা পাবেন।

৩। টাকা এবং পাসপোর্ট ফরম জমা উভয়ই আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিসে দিতে হবে।

ভিসার জন্য ভিসা অফিস থেকে ভিসা ফরম নিয়ে পূরণ করে পাসপোর্ট সহ জমা দিলেই ভিসা হয়। এতে কোন টাকা খরচ হয় না।

কবিতা–

পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়

গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত চারিদিক,
অস্পষ্ট সবই, কিছুই যায় না চেনা,
বিভ্রান্ত মানবকূল দিশেহারাকোথা গেলে
মিলবে এর কিনারা?

আতঙ্ক হতাশা দুঃখ যাতনা দিকে দিকে
ধর্ম সমাজ সুমতি ধ্বংস আজ
সর্বত্র হাহাকার জ্বলছে অগ্নি শিখা
বাঁচবার পথ নেই সবাই নিরূপায়!

ধর্মের নামে অশান্তি ছড়ায় মোল্লা
পুরোহিত
মানুষ যেন নাচের পুতুল নেই হিতাহিত।
আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব আজ প্রশ্নের মুখোমুখি
দলিল প্রমাণ নিয়ে দাড়াবার কেউ নেই,
জাগতিক বিলাস বাসনায় বিভোর সকলেই।

জ্বলছে ইরাক, আফগান, ফিলিস্তিন
কে বাঁচাবে তাদের ইসলাম সে খলীফা বিহীন!
ঈমান আমলে মুসলিম আজ নিঃস্ব প্রায়
ধ্বংসই যেন অমোঘ নিয়তি বাঁচার নাই উপায়!

হেন কালে দেখ রহমান খোদা করুনার সাগর
পাঠালেন ফুা ইমাম আলোকিত সব প্রান্তর;
এসেছে মাহদী (আ.) আলোর মশাল হাতে তাঁর
নতুন আদম যেন সূচনা করতে নতুন সভ্যতার,
ঐশী শক্তি, আসমানী সাহায্য সঙ্গে রয়েছে তাঁর,
তিনিই এ যুগের মুক্তির দূত রহমান খোদার!

খিলাফতের নব ধারা
সূচিত হল পুনর্বার
খোদার রজ্জু একমাত্র উপায় বাঁচিবার;
পশ্চিমাকাশে খিলাফত রবি
অবাক বিস্ময়ে দেখছে জগতবাসী,
খিলাফতে আহমদীয়া অন্ধকার এ যুগে
নতুন সূর্যোদয় আলোর ঝর্ণধারা,
চেয়ে দেখ চারিদিকে পড়ে গেছে সাড়া
ত্বরাতে ইসলাম ইহাই একমাত্র পথ
এসেছে "খিলাফত আলা মিনহাজিন
নবুওয়ত"!

মোহাম্মদ আখতারুরজ্জামান

জামাআত ও অংগসংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতার সংবাদ

ডেস্ক নিউজ ঃ হোসনে মোবারক

শতবার্ষিকী খিলাফত জুবিলী উপলক্ষে 'ওয়াকফে নও' সমাবেশ

২৭ মে ২০০৮, চট্টগ্রাম।

শতবার্ষিকী খিলাফত জুবিলী ২৭ মে, ২০০৮ সারা বিশ্বে বিশেষভাবে পালিত হয়। তারই ধারাবাহিকতা হিসাবে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, চট্টগ্রামের সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে ৪ ঘন্টার একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চট্টগ্রাম জামাআত। ওয়াকফে নও সদস্য/সদস্যা ও তাদের পিতা-মাতাগণ এতে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় ২৭ মে ২০০৮ বেলা ১০ টায়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মুসলে উদ্দীন খাদেম (ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল), নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, চট্টগ্রাম। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তেলাওয়াত করেন মাস্টার বাসেল আহমদ, নযম পাঠ করেন বুসরা মজিদ। এরপর উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন স্থানীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারী জনাব এম, আরিফ-উজ-জামান। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ হাসান ফুলু। এরপর সকলের মধ্যে হাল্কা নাস্তা বিতরণ করা হয়। এরপর কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, খেলাধূলা, পয়গামে রেশানী, স্মতিশক্তি পরীক্ষা ও ছোটদের ছবি অংকন প্রতিযোগিতা হয়। যোহর নামাযের পর স্থানীয় আমীর জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী সাহেব বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এই দিনে শিশুদের মধ্যে 'ওয়াকফে নও' খচিত টুপি ও একটি বিশেষ লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এম. আরিফ-উজ-জামান

সেক্রেটারী ওয়াকফে নও।

২৩তম রিজিওনাল ইজতেমা ২০০৮ চট্টগ্রাম ও সিলেট রিজিওন

২৪ জুলাই, তারুয়া।

গত ১৭, ১৮ ও ১৯শে জুলাই রোজ বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, তারুয়ার মসজিদে বাশারত এ ২৩তম রিজিওনাল ইজতেমা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলীর এই ইজতেমা খোদা তাআলার রহমতে পরিপূর্ণ ছিল। চরম প্রতিকূল আবহাওয়া ইজতেমার দিন সকাল থেকেই সম্পূর্ণ অনুকূল হয়ে যায় এবং ইজতেমার শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া ভাল ছিল। নিঃসন্দেহে তা ছিল হুযূর আকদাস (আই.)-এর দোয়ার বরকত। ১৭ জুলাই বাদ মাগরিব কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব মারুফ আহমদ এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুল মোমেন, মোয়াবিন সদর, জনাব এস, এম ইব্রাহীম, রিজিওনাল কায়েদ এবং জনাব জহির আহমদ মিয়াজী, প্রেসিডেন্ট, তারুয়া জামাআত। রিয়াজ আহমদ এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হয়। আহাদ পাঠ এর পর উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব এস, এম, সেলিম। উদ্বোধনী ভাষণের পর সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি জনাব শেখ সাব্বির আহমদ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর উপস্থিত সম্মানিত অতিথিগণ ও রিজিওনাল কায়েদ সাহেব নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনের পর প্রতিযোগিতা পর্ব শুরু হয় এবং ১৯ জুলাই দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে খাদেম ও তিফলদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ জুলাই বিকাল ৩টা হতে ইজতেমার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন। মোহতরম নায়েব সদর-১ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠ করেন প্রথম স্থান অধিকারী খাদেম এস, এম আরমান এবং তিফল নাসের আহমদ দোলন, (ঘাটুরা মজলিস)। অতঃপর বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোজাফফর আহমদ রাজু (মোয়াল্লেম) ও রিজিওনাল কায়েদ সাহেব। ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব জুয়েল আহমদ শুকরিয়া জ্ঞাপন করার পর সভাপতি সাহেব সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন। সমাপনী ভাষণের পর সভাপতি সাহেব বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী খাদেম ও তিফলদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমা সমাপ্ত হয়। এবারের ইজতেমার অন্যতম আকর্ষণ ছিল নুসরতাবাদ মজলিস হতে ৬ জন খাদেম ১৭০ কি. মি. পথ সাইকের চালিয়ে ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। তাদের সাথে কুমিল্লার একজন, ঘাটুরার একজন, শালগাঁও মজলিসের একজন সহ মোট নয়জন খাদেম সাইকেল চালিয়ে ইজতেমায় যোগদান করেন যা ইজতেমার আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। আকর্ষণীয় ব্যানার ও ফেস্টুন ইজতেমার আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছিল। এবারের ইজতেমায় অত্র রিজিওনের ১৮টি মজলিস হতে মোট ২২২ জন খাদেম ও তিফল অংশ গ্রহণ করেন যা উপস্থিতির দিক থেকে পূর্বের সকল ইজতেমা হতে সর্বাধিক ছিল।

শেখ সাব্বির আহমদ (উজ্জ্বল)

সেক্রেটারী

২৩তম রিজিওনাল ইজতেমা /০৮

রিজিওনাল ইজতেমা ঢাকা-বরিশাল রিজিওন

৩ আগস্ট ২০০৮, দারুত তবলীগ।

ঢাকা বরিশাল রিজিওনের ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১৮ ও ১৯ জুলাই তারিখে। রিজিওনাল ইজতেমায় উপস্থিত ছিল মোট ৩৩৫ জন। যার মধ্যে খোদ্দাম ২৪৮, আতফাল ৬৯ জন, এবং মেহমান ছিল ১৮ জন। ইজতেমায় ১৮টি মজলিস থেকে প্রতিযোগিরা উপস্থিত হয়েছিল। মজলিসগুলো হলো–ঢাকা, তেজগাঁও, মিরপুর, গাজীপুর, উত্তর বাহেরচর, নেত্রকোনা, ছোনটিয়া, জামালপুর, রাংটিয়া, পটুয়াখালী, বরিশাল, খাকদান ও কৃষ্ণনগর। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে উৎসাহিত করেন ভারপ্রাপ্ত ন্যাশনাল আমীর জনাব মীর মুবাশ্বের আলী এবং মোহতারাম সদর সাহেবের প্রতিনিধি নায়েব সদর জনাব এডভোকেট আব্দুস সামাদ।

মাহবুবুর রহমান জেপি, চেয়ারম্যান

ইজতেমা কমিটি,

ঢাকা-বরিশাল রিজিওন।

নাসেরাত দিবস

২০ জুন ২০০৮, চট্টগ্রাম।

গত ২৩ ও ২৪ মে নাসেরাতুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের উদ্যোগে 'নাসেরাত দিবস' অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ মে শুক্রবার বাদ জুমুআ নাসেরাতদের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ মে শনিবার সকাল ১০-৩০ মিনিট থেকে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। ঐ দিন নাসেরাতদের দেয়ালিকা "আল মাশরেক" এর তৃতীয় সংখ্যা উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও দেয়ালিকার উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ও লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের প্রেসিডেন্ট সাহেবা মিসেস রওশন আরা আহমদ। এই অনুষ্ঠানে নাসেরাতদের জন্য তালিমী পরীক্ষা, রচনা প্রতিযোগিতা ও খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। পুরস্কার বিতরণীর পর সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন স্থানীয় আমীর সাহেব ও মুরব্বী সাহেব। আমীর সাহেব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটান। খিলাফত জুবিলীর মাসে অনুষ্ঠানটি হয় বিধায় প্রত্যেক গ্রুপের বক্তৃতার বিষয় নির্ধারণ করা হয় খিলাফতের উপর। এ ছাড়াও ঐ দিন খিলাফত জুবিলী উপলক্ষে ১০টি বাসায় নাস্তা বিতরণ করা হয়।

সানজিদা শারমিন

সেক্রেটারী নাসেরাত।

কৃতী ছাত্র

আল্লাহ্ তাআলার অশেষ কৃপায় এবার এস, এস, সি পরীক্ষায় আমার ছেলে ওয়াসিম আহমদ সিলেট ক্যাডেট কলেজ হতে মানবিক বিভাগে G.P.A-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, (আলহামদুলিল্লাহ্)। সে একজন ওয়াকফে নও (নম্বর ১০৪৭৪)। ভবিষ্যতে সে যেন আরো ভাল ফলাফল করতে পারে সেজন্য জামাআতের সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী।

পিতা-মোহাম্মদ সুরুজ আহমদ

মাতা-আফরুজা সুলতানা

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, সরিষাবাড়ী, (জামালপুর)।

শুভ বিবাহ

• গত ৯-১১-০৭ আফরিন আক্তার হাসি, পিতা-আব্বাছ উল্লাহ্ সিকদার, নাটাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে ফজলে এলাহী, পিতা-মরহুম সিদ্দিক আহমদ, ফাজিলপুর ফেনী এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৯৩/০৭

• গত ৩১-১২-০৭ মোছাঃ সামিনা আক্তার (মনি) পিতা-মরহুম তোতা মিয়া, আহমদনগর, পঞ্চগড় এর সাথে নূর আহমদ, পিতা-মজিবর রহমান, আহমদনগর, পঞ্চগড় এর সাথে ৩০,০০১/- (ত্রিশ হাজার এক টাকা) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৯৪/০৮

• গত ২৪-১২-০৭ মোছাঃ জেসমিন আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ ফরিদ আহমদ, শালশিড়ী এর সাথে মোহাম্মদ সুজন আহমদ সরল, পিতা-মৃত সহীদুল ইসলাম, কাফুরিয়া এর বিবাহ ৩৫,০০০/- (পয়ত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৯৫/০৮

• গত ২৮-১২-০৭ মোছা ঃ মুকীলা আক্তার রিপা, পিতা-জনাব শফিকুল ইসলাম মুকুল, কাফুরিয়া, নাটোর এর সাথে আব্দুল আলিম, পিতা-আব্দুস সাত্তার গ্রাম+পোঃ যতীন্দ্রনগর সাতক্ষীরা এর বিবাহ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৯৬/০৮

• গত ০৪-০১-০৮ তামান্না রহমান পিতা- ডাঃ লতিফুর রহমান, ১৯২১ কানে হো স্ট্রীট কারোনো ক্যালিফোরি-নয়া ৯২৮৮ এর সাথে মোহাম্মদ আবরার হোসেন, পিতা-অধ্যাপক আমীর হোসেন, জি, টি, আই, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর বিবাহ ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৯৭/০৮

• গত ১১/০১/০৮ স্বার্ণা খাঁন, পিতা-মতিউর রহমান খাঁন, ৭০ ক্রিসেন্ট রোড,

কলাবাগান, ঢাকা এর সাথে মুকিত মাহমুদ পিতা-আব্দুল মুকিত মাহমুদ জ্জামান, বাড়ী ৩৭৩, রোড-২ ট, ডি ও এইচ এস, মহাখালী, ঢাকা এর বিবাহ ৩,০০,০০১/- (তিন লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৯৮/০৭

• গত ২০/১২/০৭ মিস ফাতেমা পারভীন পিতা-মৃত করিম গাইন, গ্রাম+পোঃ যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর সাথে এস, এম শাহরিয়া (নিউটন) পিতা-আহমদ আলী মোল্লা, গ্রাম+পোঃ যতীন্দ্রনগর শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর বিবাহ ২০,০০১/- (বিশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৬৯৯/০৮

• গত ২১/১২/০৮ উসামা মেহেরার স্যালিহা, পিতা-আকরাম আহমদ খাঁন চৌধুরী, বাড়ী-১০, ব্লক ১/এ, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬ এর সাথে মনজুরুল এ শিকদার পিতা-ইরফান শিকদার, ১৮৮-০১ ৮৭ হলিউড এর বিবাহ $ ১৫,০০০ (পনের হাজার ইউএস ডলার) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৭০০ /০৮

• গত ১৮/০১/০৮ সালমা জলিল, পিতা-মুহাম্মদ আব্দুল জলিল, সাভার, ঢাকা এর সাথে আব্দুল কুদ্দুস, পিতা-মনির হোসেন, গ্রাম বাতাবাড়িয়া, পোঃ হালিমানগর সদর (দঃ), কুমিল্লা এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭০১ /০৮

• গত ০৭/০৯/০৭ মোছাঃ রিপা আক্তার পিতা- মৃত আব্দুল মনাফ চৌধুরী, জামালপুর (হবিগঞ্জ) এর সাথে তফসীর আহমদ, পিতা-আব্দুর রাজ্জাক গ্রাম+পোঃ তাহির পুর, জেলা সুনামগঞ্জ এর বিবাহ ৫০,১০১/- (পঞ্চাশ হাজার একশত এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৭০২ /০৮

• গত ১৬/১২/০৭ মোছাঃ উম্মে হানি (সেতু) পিতা-আব্দুল হামিদ শেখ, দিঘাপাতিয়া, থানা+জেলা নাটোর এর সাথে খলীলুর রহমান পিতা জনাব ইসলাম মিয়া, কসাইটুলি, পোঃ মাহিগঞ্জ, থানা+জেলা রংপুর এর বিবাহ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৭০৩ /০৮

•গত ০২/০২/০৮ রওনক ফারাহ্ তারিন, পিতা-রওশন আলী, ১১২ উত্তর শিমরাইল কান্দি, দক্ষিণ আহমদী পাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে শেখ মুস্তাফিজুর রহমান পিতা-শেখ মাহফুজুর রহমান যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭০৪ /০৮

রিস্তানাতা দপ্তর

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, বাংলাদেশ।

ঘোষণা

'জ্ঞান-জিজ্ঞাসা' শীর্ষক ফিচার নিয়মিত প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে ধর্ম বিষয়ক ও সমাকালীন প্রেক্ষাপটের ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ প্রদান করা হবে। ইনশাআল্লাহ্!

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের কাছ থেকে এতদ্বিষয়ে সুচিন্তিত প্রশ্ন আহ্বান করা যাচ্ছে। আমাদের ঠিকানা –

সম্পাদক

পাক্ষিক আহমদী

৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

বাংলাদেশই-মেইল–

pakkhik_ahmadi@yahoo.com

পাঠকের অভিমত

বরাবর

সম্পাদক সাহেব

পাক্ষিক আহমদী

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি খোদার ফযলে ভাল আছেন। আপনার বহুল প্রচারিত 'পাক্ষিক আহমদী'র ৭১তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (৩১ জুলাই) হাতে পেয়ে খুব ভাল লেগেছে প্রচ্ছদটি। এ সংখ্যার প্রচ্ছদটিতে ভিতরের যা কিছু আছে তার শিরোনামগুলি উপরে থাকায় আরো আকর্ষণীয় হয়েছে। আমরা আশা করবো এখন থেকে এ ধরনের প্রচ্ছদ আমাদের সামনে আসতে থাকবে। এছাড়া পাক্ষিক আহমদীতে নতুন নতুন বিষয় প্রকাশিত হচ্ছে যা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে ও জানতে পারছি। ৩১ জুলাই সংখ্যার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে লেখাটি আমাদের জন্য খুব তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধশালী একটি লেখা হিসেবে মনে হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক উপকার হবে।

এছাড়া পাক্ষিক আহমদী'তে যদি ধর্মীয় লেখালেখির পাশাপাশি ভ্রমণ কাহিনী, শিক্ষামূলক, স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং প্রশ্ন উত্তর পর্ব নিয়মিত চালু করে তাহলে আমাদের আরো ভালো লাগবে।

আমি পাক্ষিক আহমদীর সার্বিক মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি।

পাক্ষিক আহমদী'র পাঠিকা

আঁখি মণি

আহমদনগর পঞ্চগড়

০৮/০৮/২০০৮